বাঁচামরা

পরিতোষ মজুমদার

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

প্রকাশক :

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

‘করুণা প্রকাশনী’

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :

বিষ্ণুপদ চৌধুরী

প্রিণ্ট হোম

২০৯এ, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

মদন সরকার

সূচীপত্র

ভোলাবাবুর গল্প



নমস্কার।

আপনারা নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাননি। আমি সেই আপনাদের তারাপদ বাবু। অনেকদিন বাদে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, আপনারা নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাননি।

তাই বলে, আমার সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত শুভানুধ্যায়ীর মত করবেন না।

সেদিন সকালে পোস্টাফিস থেকে বেরোবার মুখে ভদ্রলোক দু'বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর সে কি উচ্ছ্বাস, 'কি রে, গোবরগোপাল! আরে

বহুকাল পরে দেখা!'

আমি ভদ্রলোককে মোটেই চিনতে পারলাম না, চেনার কথাও নয়। আমি তাঁকে কস্মিনকালেও দেখিনি। আমি বিব্রতভাবে তাঁর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করলাম। সেই সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম, 'আপনি কিন্তু খুব ভুল করেছেন। আমার নাম গৌরগোপাল নয়।'

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, 'কত রোগা ছিলি, মোটা হয়ে গেছিস। কত ফর্সা ছিলি, কালো হয়ে গেছিস। তোর মাথায় টাক ছিল, টাকটাই বা কি হল?'

আমি বললাম, 'বলছি তো আমি মোটেই আপনার গৌরগোপাল নই। আমার নাম তারাপদ।'

এবার ভদ্রলোক আমাকে ভর্ৎসনা করলেন, 'ছি! ছি! শেষে নামটাও বদলিয়ে ফেলেছিস।'

এই হালকা গল্পটি দিয়ে আরম্ভ করে এবার আমরা ভুলের তত্ত্ব আলোচনায় যেতে পারি।

সেই কবে এইচ জি ওয়েলস বলেছিলেন, 'খুব সহজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় যদি খুব বড় রকম একটা ভুল করা যায়। সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই।'

চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস থেকে শুরু করে কালে কালে মহাজনেরা নানারকম সব কথা বলেছেন। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে, আলাদা আলাদা করে না বলে, মোটামুটিভাবে বলছি।

সেই ভুলই হল সবচেয়ে বড় ভুল যে ভুল থেকে আমরা কিছুই শিখি না। যে মানুষ কখনও ভুল করে না, সে কখনও কিছু শেখেও না। তুমি ভুল না করে জগৎ সংসারে কিছুই করতে পারবে না। যে লোক কখনও কোন ভুল করে না, সে আসলে কোন দিন কিছু করেও না। সাধারণত তিনটি কারণে ভুল হয়, ক) 'আমি জানতাম না', খ) 'আমি ভাবিনি বা বুঝতে পারিনি' এবং গ) 'আমি পরোয়া করিনি।'

সবচেয়ে মজার কথা বলেছিলেন জেনকিন্স, 'মানুষ ভুল করবেই। কিন্তু যখন সেই ভুল শুদ্ধ করতে করতে ইরেজার বা রাবার পেনসিলের আগে ফুরিয়ে যায়, তখন বুঝবে ভুল একটু বেশি হচ্ছে।'

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সেই ভুলো মানুষের গল্প তো সকলেরই জানা। সে বেচারি রাতে বাড়ি ফিরে হাতের লাঠিটা বিছানায় বালিসের ওপর শুইয়ে দিয়ে নিজে দরজার পাশে লাঠি রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেন।

এই ভুলো মানুষ বা ভোলাবাবু সব জায়গাতেই বিদ্যমান, সব পাড়ায়, সব অফিসে, সব সংসারে।

পুণ্যশ্লোক শিবরাম চক্রবর্তী এক ভোলাবাবুর কথা লিখেছেন। ভোলাবাবু অফিস যাচ্ছেন, পথে লোকের পর লোক তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, 'দাদা, বৌদির চিঠিটা ডাকে ফেলতে ভুলবেন না যেন।' অফিসেও জনে জনে সেই একই অনুরোধ।

ভোলাবাবু অবাক হলেন এই ভেবে যে এত লোক জানল কি করে যে অফিসে বেরোনোর সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে একটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছেন।

অবশ্য রহস্য খুব জটিল নয়। ভোলাবাবুর অফিসে আসার কোটের পিছনে তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী একটা আলপিন দিয়ে নোটিশ লটকিয়ে দিয়েছেন। নোটিশটির পুরো ভাষা আমার মনে নেই। হাতের কাছে শিব্রাম অমনিবাসে'ও গল্পটা দেখছি না। তবে সেই নোটিশের বক্তব্য ছিল অনেকটা এই রকম : —

নোটিশ

<u>ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি অনুরোধ</u>

আমার স্বামী খুব ভুলোমন। তাঁকে একটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছি। দয়া করে তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন।

স্বর্গত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক অনবদ্য কিশোর কাহিনীতে ভোলাবাবুকে জ্যাঠামশায়ের ভূমিকায় উপস্থাপন করেছিলেন।

সেই ভোলাজ্যাঠা ভাইয়ের বাড়ি থেকে ফিরছেন। স্টেশনে নাবালক ভাইপো সি অফ করতে অর্থাৎ বিদায় জানাতে এসেছে। রেলগাড়ি ছাড়ার হুইসল দিয়েছে।

ভোলাজ্যাঠা কুলির প্রাপ্য না মিটিয়ে তার চিবুক তুলে একটা চুমু খেলেন। তারপর ভাইপোর করতলে একটা সিকি দিয়ে বললেন, 'এবার যা, এর থেকে বেশি দেব না। ফিকর মৎ করো।'

গল্প-উপন্যাসের চরিত্রেরাই শুধু ভোলাবাবু কিংবা ভোলাবৌদি নন। ঘরে বাইরে বাস্তব জীবনে তাঁরা সর্বত্র।

সত্যিকারেব একটা ঘটনা বলি।

এক তরুণ দম্পতি, এই পুজোর ছুটিতে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন। বয়েস কম দু'জনারই, ভ্রমণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও খুব নেই। ফলে যা হযেছে, লটবহব মালপত্র অতিরিক্ত হয়ে গেছে।

যাওয়াব প্রোগ্রাম দক্ষিণ ভারতে। মাদ্রাজ তথা চেন্নাই থেকে বামেশ্বরম,

কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। সব জায়গায় হোটেল বুক নেই। তার ওপরে নারকেল তেলের নিরামিষ রান্না। সঙ্গে কাঁথা-কম্বল, আচার কাসুন্দি এমনকি শুঁটকি মাছের প্যাকেট। এই শেষ শরতে, কোথায় কোন আবহাওয়া, কতটা গরম, কতটা ঠাণ্ডা কিছুই জানা নেই। সুতরাং ওই কাঁথা-কম্বলের সঙ্গে চাদর-আলোয়ান, কোর্ট-সোয়েটারও নিতে হল।

তারপরে চায়ের সরঞ্জাম, রান্নার সরঞ্জাম। সরষের তেল থেকে কেরোসিন তেল। চায়ের কেটলি থেকে জনতা স্টোভ। শ্রীমানের চেয়ে শ্রীমতী আরও গোছান, তিনি সঙ্গে পাপোষ এবং গামছাও নিয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিনে ট্রেন ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে ভ্রমণ দম্পতি রেল স্টেশনে এসে পৌঁছালেন। সঙ্গে উনিশটি ছোট-বড় মাল। আটজন কুলি লাগল।

কুলিরা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছে। এই সময় শ্রীযুক্ত ভ্রমণ শ্রীমতী ভ্রমণকে বললেন, 'ফ্রিজটা নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

শ্রীমতী ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'ঠাট্টা করা হচ্ছে?'

শ্রীমান বললেন, 'মোটেই ঠাট্টা নয়। ফ্রিজের ওপরে রেলের টিকিট দু'টো রয়েছে। ভুলে ফেলে এলাম যে।'

এলোমেলো

কি ভীষণ শীত পড়েছে এ বছর। এমন ঠাণ্ডা কস্মিনকালেও দেখিনি। এ শহরে আছি পঞ্চাশ বছর। কলকাতায় এমন রক্ত হিম করা, হাড় কাঁপানো শীত আর কখনো পড়েনি।

শীতের বাতাসে শুধু গাছের শুকনো পাতাই ঝরে যাচ্ছে তা নয়। শুধু মরশুমি পাখিরাই উড়ে আসছে তা নয়। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে শীতের বাতাসে।

একশো বছর আগে মহিলা কবি আশ্চর্য লিখেছিলেন,

পৌষের উলাউলা বাতাস আসিয়া
এলাইয়া মেলাইয়া পলাইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথও শীতের কবি ছিলেন, যদিও সমালোচক-অধ্যাপকরা তাঁকে বর্ষার কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে ভালবাসেন। রবীন্দ্রনাথের শীত ঋতু খুব দীর্ঘ। এই মুহূর্তে তিনটি কবিতার কথা মনে পড়ছে, পরপর তিনটি মাসের শীতের প্রখরতার কথা দিয়ে যেগুলির প্রথম পংক্তি। ক্রমানুসারে বলি,

(এক) অঘ্রাণে শীতের রাতে
নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে
মরিয়া গিয়াছে ফুলগুলি।

(দুই) পউষ প্রখর শীতে জর্জর
ঝিল্লি মুখর রাতি।

(তিন) বহে মাঘমাসে শীতের বাতাস....

প্রকৃতই শীতের কবি ছিলেন জীবনানন্দ। স্থবিরতার জন্যে অপেক্ষায় তিনি নির্জন শীতের রাতে প্রদীপ নিভিয়ে বিছানায় বসে থাকার কথা বলেছিলেন।

কবিতার কথা আপাতত থাক। এই এলোমেলো শীতের বাতাসে আমার এই হাল্কা কলমে দুয়েকটা এলোমেলো গল্প বলি।

প্রথম গল্পটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার।



এ বছর শীত একা আসেনি। সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি ও বাতাসও নিয়ে এসেছে।

থাকি পূর্ব কলকাতায় লবণহ্রদে। এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর ছেলের বিয়ের বৌভাতে দক্ষিণ কলকাতায় যাদবপুরের দিকে যেতে হয়েছিল।

মোড়ের মাথা থেকে সন্ধ্যার দিকে একটা ট্যাক্সি ডেকে এনে রওনা হলাম। দুপুর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। এই সন্ধ্যার দিকটায় বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছিল।

কিন্তু আমার ভাগ্য খারাপ। সল্টলেক থেকে বেরিয়ে ইস্টার্ন বাইপাসে পড়তে না পড়তে মুষলধারে বৃষ্টি এল। শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকার আর ঘন বৃষ্টিতে চারদিকে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এই সময়ে সভয়ে আবিষ্কার করলাম আমি যে ট্যাক্সিটায়, তার কাঁচের ওপর কোন ওয়াইপার নেই।

এক মধ্যবয়স্ক মোটাসোটা ব্যক্তি, বোধহয় বাঙালিই হবেন, ট্যাক্সি চালাচ্ছিলেন। তাঁকে বললাম, 'আপনার গাড়িতে ওয়াইপার নেই।'

তিনি বললেন, 'আছে। চুরি যাবে বলে খুলে রেখেছি।'

আমি বললাম, 'গাড়ি থামিয়ে চটপট করে লাগিয়ে নিন। দুর্ঘটনা হয়ে যাবে যে, সামনে পিছনে কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না।'

ড্রাইভার ভদ্রলোক বললেন, 'কি আর দেখা যাবে স্যার? আমার ডান চোখের পাওয়ার প্লাস সাত, বাঁ চোখের পাওয়ার প্লাস ছয়। আজকে আবার ভুল করে চশমাটাই বাড়িতে ফেলে এসেছি।'

আমি বললাম, 'তা হলে?'

তিনি বললেন, 'ভগবান ভরসা।'

সত্যিই ভগবান ভরসা, সেদিন নিমন্ত্রণ খেয়ে বিনা দুর্ঘটনায় অক্ষত দেহে যথাসময়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম।

তার পরের দিন ঘন কুয়াশা। আশেপাশে তবু যা একটু নজর করা যাচ্ছে, ওপরের দিকে তাকালে কিছুই চোখে পড়ছে না।

আমাদের প্রতিবেশীর শিশু নাতনিটি সবে বাকপটু হয়েছে। এ রকম কুয়াশা সে আগে কখনো দেখেনি। সেদিন ঘুম থেকে ভোরবেলায় উঠে চারদিক এবং মাথার ওপরে দেখে সে বলল, 'আকাশ নিচে নেমে এসেছে।' এরকম কবিত্বশক্তির প্রকাশ একজন শিশুর পক্ষেই শুধু সম্ভব।

নাম

নামের প্রসঙ্গ দু'জন কবিকে দিয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'নাম' কবিতায় লিখেছিলেন,

'চাই, চাই, আজো চাই
তোমারে কেবলি...
...নাম - শুধু নাম - শুধু নাম।'

নাম বিষয়ে মহামতি শেক্সপীয়ারের উক্তিটি সুবিদিত। শেক্সপীয়ারের নাটকের একটি চরিত্র বলেছিল, 'গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন গোলাপের সুবাস একইরকম থাকবে।'

এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমী গল্প আছে। গল্পটি অত্যন্ত সরস এবং সুপরিচিত।

দিদি-বোনের গল্প। দিদির বয়স তেরো আর ছোট বোনটির সাড়ে আট, মেরে কেটে নয়।

দিদি বয়সোচিত আনন্দে, বেণী থেকে খোঁপায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুবাদে চুলে একটা ফুল গুঁজেছে। ছোট বোন কৌতূহলী হয়ে দিদিকে বলল, 'কি খুশবু, দিদি তোর চুলে ওটা কি ফুল রে গোলাপ নাকি রে?'

দিদি গম্ভীর হয়ে বলল, 'না।'

বোন ছাড়ার পাত্রী নয়, সে বলল, 'তাহলে ওটা কি ফুল?'

দিদি অনেক ভেবেচিন্তে বলল, 'রডোডেনড্রন।'

বোন বলল, 'রডোডেনড্রন না কি বললি? বানান কি হবে রে?'

দিদি বলল, 'র, ড উয় ও-কার, উয় এ-কার, ন, ড... এত বড় বানানে দিদি এখানে এসে আটকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না রে, তোকে ভুল বলেছি, তুই যা বলেছিলি তাই, এটা হল গ'য় ও-কার, ল'য় আ-কার আর প, গোলাপ।'

নাম যে কত রকমের হয়।

আমাদের ছোট বয়সে টাঙ্গাইল শহরে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নেমপ্লেট তথা সাইনবোর্ডে চার রকম জীবিকার দৃষ্টান্ত পেয়েছি। ভদ্রলোকের নেমপ্লেটে লেখা ছিল,

'ডাঃ কাজী গোলাম মোখতার।' প্রথমে ডাঃ (ডাক্তার) অর্থাৎ চিকিৎসক। অতঃপর কাজী, কাজী হল মুসলমান শাসনকালে সরকারি বিচারবিভাগীয় স্থানীয় আধিকারিক, তাঁর বিচারই কাজীর বিচার; তদুপরি 'মিঞা-বিবি রাজি, কেয়া করেগা কাজী?' এই আশ্চর্য প্রবাদ বাক্যটির তিনি জন্মদাতা।

লোকে বলত কাজী ডাক্তার, গোলাম কিংবা মোখতার নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না, কিন্তু এ দু'টোও জীবিকা। প্রথমটি চাকরি এবং দ্বিতীয়টি ওকালতি।

কাজী ডাক্তারের নামটি বেশ লম্বা। কিছু এর চেয়েও বড় নাম গুইনেসের রেকর্ড বুকে আছে। অল্প বয়সে সেকালের অবিসম্বাদী বুক অফ রেকর্ড 'জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড' বইতে দীর্ঘতম নামের উদাহরণ পেয়েছিলাম, 'গোপিজনবল্লভ পদরেণু দাস।'



নাম শুধু নাম নয়। নামের সঙ্গে অনেক কিছু থাকে। ডাক্তার বা অধ্যাপক, এমনকি কবি পর্যন্ত আজকাল নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন কবি শক্তি

চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। ডাক্তার আবার দু'জাতের, পাণ্ডিত্যের এবং চিকিৎসার, যেমন ডঃ পবিত্র সরকার এবং ডাঃ সঞ্জয় সেন।

এসব বাদ দিয়ে এবার আমার নামটা নিয়ে কিছু বলি।

আমার নামটা খুবই পুরনো ধরনের, পিতামহ প্রদত্ত। এই নামটাকে ইংরেজি করে দু'জন বিখ্যাত কবি আমাকে ডাকতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং অ্যালেন গিনারবার্গ, সম্প্রতি পরলোকগত এই দুই কবিই আমাকে 'টর্পেডো' বলে ডাকতেন।

নাম নিয়ে একদা আমি একটা সমস্যায় পড়েছিলাম। রাস্তায় হঠাৎ এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, দেখেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, 'এই যে নবলাল। কতকাল দেখা নেই। রং ফর্সা ছিল কালো হয়ে গেছিস। কি মোটা হয়ে গেছিস। তুই একদম বদলিয়ে গিয়েছিস নবলাল।'

আমি বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করলাম, 'আপনি ভুল করছেন। আমি নবলাল নই, আমি তারাপদ।'

বিস্মিত ভদ্রলোক বললেন, 'সেকি তুই নামটাও গুলিয়ে ফেলেছিস।'

রেলগাড়ি

'রেলগাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম!'

যে অজ্ঞাত পরিচয় ছড়াকার এই আশ্চর্য পংক্তিদ্বয়ের সমাহার ঘটিয়ে এই অসামান্য ছড়াটি রচনা করেছিলেন, রেলগাড়ির গতি তাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। না হলে পা পিছলে আলুর দম প্রসঙ্গ আসত না।

যে যুগে এই ছড়াটি রচিত হয়েছিল, রেলগাড়ির সেই আদিযুগে ট্রেনের যে সর্বোচ্চ গতি ছিল এখনকার ট্রেনের গতি তার চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি।

কিন্তু এত গতিবেগ সত্ত্বেও রেলগাড়ি এদেশে মানে ভারতীয় রেল এখনও সঠিক সময়ে চলতে পারে না। কোনও দূরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ে স্টেশনে এসে গেলে সেটা প্রায় অভাবনীয় ঘটনা হিসেবে ধরা যায়।

গল্প আছে, কোনও এক জংশন স্টেশনে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়। বিলিতি কেতাদুরস্ত এক সম্ভ্রান্ত যাত্রী এই অভাবিত

কাণ্ড দেখে ট্রেনে উঠে সামনে বসে থাকা টিকিট চেকারকে প্রচুর ধন্যবাদ জানালেন।



ধন্যবাদ শোনার পরে টিকিট চেকার গম্ভীর মুখে যাত্রীটির টিকিট দেখতে চাইলেন। টিকিট দেখে তিনি বললেন, 'এ টিকিট আজকের।'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ। আজকের তারিখের টিকিট।'

টিকিট চেকার বললেন, 'এ টিকিটে চলবে না। এটা গতকালের ট্রেন, চব্বিশ ঘণ্টা লেট। নেমে যান।'

গল্প সে গল্পই।

সত্যি ঘটনা হল, বড়দিনে হায়দরাবাদ গিয়েছিলাম, আরও অনেকের সঙ্গে, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সত্তরতম অধিবেশনে, ফিরলাম নতুন বছরে।

ফলকনামা এক্সপ্রেস নামে সুপার ফাস্ট ট্রেনে গিয়েছিলাম। যাতায়াতের দু'দিকেই দেরি হল। যাওয়ার দিন ঘণ্টা তিনেক, আসার দিন ঘণ্টা আড়াই।

একশো কিমি ও ততোধিক বেগে সুপার ফাস্ট ট্রেন চলে। কলকাতা-হায়দরাবাদের ষোল'শ কিলোমিটার পথ পনেরো ষোলো ঘণ্টায় যাওয়া উচিত,

সঙ্গে গোটা দশ-বারো স্টেশনে দাঁড়ানোর জন্যে আরও ঘণ্টাখানেক এটুকু স্বাভাবিক। কিন্তু টাইম-টেবিল অনুযায়ী আঠাশ ঘণ্টা লাগে, আর আদপে আসে বত্রিশ ঘণ্টায়। যার মানে দাঁড়ায় গড়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে আলস্য, অকর্মণ্যতা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে এরকম হয়। যে যার কাজ ঠিকমত করে না।

ট্রেন যখন ছোটে ঝড়ের বেগে ছোটে। সেই যে গল্প ছিল না, তুফান মেল এত জোরে ছোটে যে সেই ট্রেনের ছায়া তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। ট্রেন চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে রেললাইন ধরে ট্রেনের ছায়া হাঁফাতে হাঁফাতে ছোটে।

সে যা হোক, ভারতীয় রেলপথের প্রধান দুর্বলতা হল পথের মধ্যে স্থানে স্থানে গাড়িকে অকর্মণ্য করে দাঁড় করিয়ে রাখা। বহু ক্ষেত্রেই এ জন্যে দায়ী সমন্বয়ের অভাব।

সবাই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। রেল কর্তারাও মোটেই চিন্তিত নন।

শোনা যায়, একদা এক যাত্রী গাড়ি লেটে হয়রানি হয়ে উত্তেজিত হয়ে রেলের এক বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ট্রেন যদি সময় মত নাই চলে, তবে আপনারা টাইমটেবিল ছাপেন কেন?'

সেই বড় কর্তা নাকি নির্বিকার মুখে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আরে মশায়, ট্রেন যে লেটে আসছে, টাইমটেবিল ছাপা না থাকলে সেটা কি করে বুঝতেন?'

শিশুসুলভ

বাংলায় বলা হয় শিশুসুলভ। খারাপ এবং ভালো, দুই অর্থেই শিশুসুলভ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অথবা গত জন্মের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিশুসুলভ ব্যবহারে সবাই মোহিত হতো। আবার আমার শিশুসুলভ বোকামিতে সবাই হাসাহাসি করে।

ইংরেজিতে কিন্তু ভেদাভেদ আছে। ইস্কুলের মাঝামাঝি ক্লাসে আমরা সবাই সেটা পড়েছি। Childlike এবং Childish, এই দুটো কাছাকাছি শব্দ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের।

শিশুসুলভ কাহিনীর কোন অভাব নেই। আমি বাছাই করে সর্বোত্তমটি পেশ

করছি। আমার মারফত যাঁরা গল্পটি আগে পড়েছেন, আবার পড়ে দেখুন, একটু স্বাদ বদল হয়েছে, হয়তো খারাপ লাগবে না।

তবুও সাবধানের মার নেই। গল্পাকারে না লিখে নাট্যাকারে লিখছি।



সময় বেলা দশটা। বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা পুত্রকে মা ডাকছেন, 'এই খোকা। দশটা বাজে, আর কখন স্কুলে যাবি?'

খোকা : আমি স্কুলে যাব না।

মা : সে কি? না গেলে চলবে কেন?

খোকা : কিন্তু যাব কেন? ছাত্রেরা কেউ আমাকে পছন্দ করে না। মাস্টারমশায়েরা আমাকে দেখলে ভুরু কুঁচকিয়ে তাকান। এমনকি স্কুলের দারোয়ান, দপ্তরি তারা পর্যন্ত আমাকে ঘেন্না করে।

মা : এমন বললে তো চলবে না।

খোকা : কেন চলবে না?

মা : কারণ তুমি তো আর ছোট্ট খোকাটি নও। তোমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে। তুমি ইস্কুলের হেডমাস্টার। তোমার স্কুলে না গেলে চলবে?

এইরকম শিশুসুলভ কাহিনীতে অতঃপর পুলিশকে ডেকে আনি।

বাংলা সিনেমায়, থিয়েটারে পুলিশ চরিত্র প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে,

হালকা কিংবা গভীর, সামাজিক কিংবা অসামাজিক সবরকম গল্পে পুলিশের বাঁধাধরা উপস্থিতি। এই শিশুসুলভ নিবন্ধেই তাঁকে বাদ দেব কি করে?

হাসপাতালে পুলিশের দারোগা এসেছেন ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে। তাঁকে দেখে ডাক্তাররা ছুটে এলেন, 'কি হয়েছে দারোগা সাহেব? আপনার কি হয়েছে?'

দারোগা সাহেব পায়ের গোড়ালি দেখিয়ে বললেন, 'আমাকে কুকুরে কামড়িয়েছে।'

ডাক্তার-নার্স, সমবেত অন্যান্য রোগী সবাই অবাক, 'সে কি? কুকুরের এত সাহস! আপনি হলেন গিয়ে পুলিশের দারোগা, আপনাকে কি না কুকুরে কামড়ালো!'

দারোগা সাহেব উদার হেসে বললেন, 'কুকুরটার কোনো দোষ নেই। আসলে তখন আমি সাদা পোশাকে ছিলাম কি না তাই কুকুরটা মোটেই বুঝতে পারেনি।'

নিলাম

কলকাতা শহরের নিলামের পাড়া রাসেল স্ট্রিট এলাকায় আমি একযুগ ছিলাম। অনেক রবিবারের অনেক সকালবেলা নিলামঘরে আমার কেটেছে। খুব যে বিশেষ কিছু কেনাকাটা করেছি তা নয়।

নিলামঘর অবশ্য কেনাকাটার ভাল জায়গা নয়। পাথর বা ধাতুর প্রাচীন শিল্পকর্ম, দুষ্প্রাপ্য বই, পাণ্ডুলিপি, ছবি বা রেকর্ড, সাবেকি ফার্নিচার, বেলোয়ারি ঝাড় কলকাতার নিলাম বাজারে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

নতুন বা সেকেন্ডহ্যান্ড সাধারণ ফার্নিচার, কিছু ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি, ঘর-গৃহস্থালির খুচরো জিনিস নতুন বা ব্যবহৃত—যা কিছু বাজারে পাওয়া যায় নিলামের দোকানের মোটামুটি পশরাও তাই।

তবু নিলামের দোকানে দাম হেঁকে হেঁকে জিনিস কেনার মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে।

'ফাইভ হান্ড্রেড', 'ফাইভ হান্ড্রেড', 'ফাইভ হান্ড্রেড টেন', 'ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি', 'টোয়েন্টি ফাইভ', 'ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ', 'ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ...ওয়ান', '...ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টু', ...এরপরে আরও ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ, অবশেষে নাটকীয় কায়দায় কাঠের হাতুড়ি সশব্দে

ডাকওলা তাঁর সামনের টেবিলে আঘাত করলেন একটি জিনিস পাঁচশো পঁচিশ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল।

যিনি কিনলেন, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে ধরে নিলেন খুব সস্তায় জিনিসটা পেলাম। কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

নিলামের দোকানের যে কোন জিনিসের দাম বাজারমূল্যের চেয়ে অন্তত পঁচিশ শতাংশ বেশি। এর আধাআধি ভাগ নিলামদারের কমিশন বাবদ, বাকি অর্ধেক রাজ্যসরকারের বিক্রয়কর।

তবে দামদরটা বড় কথা নয়। নিলামের একটা নেশা আছে। ঘোড়দৌড়ের মত একটা ছোটা আছে, এই ছোটা ঘোড়ায় ছোটে না, নিজেকেই ছুটতে হয়। বারো শ, সোয়া বারো শ, তেরো শ ... ধাপে ধাপে দাম চড়তে থাকে। অতিরিক্ত দাম হয়ে যাচ্ছে যে জিনিসের বাজারদর বারো শ টাকার বেশি কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়, তারই দাম হয়তো চৌদ্দ শোয় উঠে গেল। এখনও কিন্তু ডাক চলে, সেই কিছুটা উত্তেজনায়, কিছুটা নেশায় বাকিটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝোঁক থেকে।

আবেক রকম নিলাম আছে, আদালতের ক্রোক। এ কোন নিলামঘরে এর ডাক হয় না। জমি, বাড়ি, বিষয় সম্পত্তি দেনাদারদের বন্ধকী দ্রব্য সোনা, গয়না নিলামে ওঠে। সেখানে সর্বনিম্ন মূল্য নির্দিষ্ট করা থাকে। সেই নিলাম কখনও পরিচালনা কবেন সরকারি প্রশাসন, আদালত, ব্যাঙ্ক কিংবা পেশাদারি নিলাম কোম্পানি।

নায়িকার বাবার জমিদারি কিংবা বসতবাটি কিংবা দুই-ই নিলাম হয়ে যাওয়া ধনীর দুলালীর পথের ভিখারিনী হয়ে যাওয়া এক সময় বাংলা সিনেমার প্রিয় দৃশ্য ছিল।

বাংলা সাহিত্যে অবশ্য নিলামঘরের তেমন প্রভাব নেই। অবশ্য সম্পত্তি ক্রোক হয়ে ভিটেমাটি উচ্ছন্নে যাওয়া শরৎচন্দ্রে এবং শরৎপল্লীয় গল্প-উপন্যাসে আছে।

সত্যজিৎ রায়ের একাধিক অবিস্মরণীয় রহস্য কাহিনীতে নিলামের দ্রব্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পুরনো বিলিতি সিনেমাতেও নিলামঘরের দৃশ্য বিরল নয়।

বিখ্যাত বাংলা গান আছে, 'নিলামওলা ছে আনা, যা নেবে বাবু ছে আনা।' এই নিলাম কিন্তু অন্য জিনিস, স্বল্প ও সমমূল্যে বিক্রয়।

সে যা হোক, নিলামের দোকানের একটি দৃশ্য বর্ণনা করে রচনা শেষ করছি।

একটি সাধারণ ফুলদানি, বড় জোর তার দাম হবে তিনশো টাকা, নিলামে তার ডাক উঠেছে পাঁচশো টাকা। দাম পাঁচশো টাকাব ওপরে উঠতে হঠাৎ একটা সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। এদিকে নিলামদার চেঁচাচ্ছেন, 'মুখ ছেড়ে দিন,



মুখ ছেড়ে দিন, এ কি অন্যায়!'

পিছন ফিরে দেখি এক ভদ্রলোক হাত চাপা দিয়ে তাঁর স্ত্রীব মুখ আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে মহিলা আর না ডাকতে পারেন।

মশা

অনেকদিন আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা এক বন্ধুর খোঁজে বেহালায় তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন বেহালায় সাংঘাতিক মশা। ঝোপঝাড়, ডোবা, পানাপুকুর, কাঁচা নর্দমা --এগুলোর জন্যই বেহালায় মশা ছিল। সেসময় মূল কলকাতায় কালীঘাট থেকে শ্যামবাজাব পর্যন্ত কোন মশা ছিল না।

কালীঘাটের বাড়িতে আমাদেব কোন মশারি ছিল না। যত মশা ছিল, বেহালা, যাদবপুর, টালিগঞ্জে এমনকি বালিগঞ্জেও।

সে যা হোক, বন্ধুটির বাড়িতে গিয়ে বেল দিয়েছি। একটি অল্পবয়সী কাজের মেয়ে এসে দরজা খুলল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অমুক বাড়ি আছে?' মেয়েটি নীরবে ঘাড় নেড়ে জানাল 'না, নেই।'

অতদূরে কষ্ট করে গিয়ে দেখা হল না, অথচ আমার ধারণা ছিল, বন্ধুটি সন্ধ্যাবেলা বাসায় থাকে।

পরদিন বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'তুই কাল বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বেল দিয়ে তারপর চলে এলি। কাজেব মেয়েটি বাড়ির মধ্যে গিয়ে বলতে আমি বেরিয়ে এসে দেখি, তুই নেই, চলে গেছিস।'

আমি বললাম, 'তোদের মেয়েটি যে ঘাড় নেড়ে জানাল যে তুই নেই।'

বন্ধুটি বলল, 'আরে মশার জন্য ও ওরকম ঘাড় নাড়াচ্ছিল যাতে মশা মুখে না কামড়াতে পারে। আমি বাসায় না থাকলে ও সেকথা মুখে বলত। বাসায় আছি বলেই তোকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাকে বাড়ির মধ্যে ডাকতে গিয়েছিল।'



শুধু বেহালার দোষ দিয়ে লাভ নেই। একসময়ে সাবা বাংলায় মশার অত্যাচারে থরহরি কম্প দেখা দিয়েছিল। প্রকৃত অর্থেই থবহরি কম্প। চল্লিশের দশকে মহাযুদ্ধ-মন্বন্তরের যুগে ম্যালেরিয়ায় ভুগে থরহরি কম্প বাঙালি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। চারদিকের খবর শুনে কেমন যেন একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে

আসছে, বাঙালিব ইতিহাসে সেই স্ফীত প্লীহা, অস্থলে-কুস্থলে অসময়ে কম্পমান, শুষ্ক জিহ্বা, কোটরগত চক্ষুর কুইনিনতিক্ত দিনগুলি আবার কি ফিরে এল?

সেই কবে, সেও পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে, অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন,

'মশায়
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।'

এই কেশনগর হল কেষ্টনগর বা কৃষ্ণনগর, যেখানে অন্নদাশঙ্কর চাকরিসূত্রে কিছুদিন ছিলেন। সম্প্রতি কোথায় যেন অন্নদাশঙ্করের স্মৃতিকথায় পড়লাম এই ছড়াটি তিনি লিখেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে চলে আসার পরে।

অন্নদাশঙ্করই পারেন মশক দংশনের বিষাক্ত স্মৃতিকে এমন সরস ও সুললিত ছড়ায় উপহার দিতে, আমরা পারি না।

আমরা তা পারি না। কিন্তু আমি একটা জিনিস পেরেছিলাম, সেও পঁচিশ বছর আগে, ডোডো-তাতাই গল্পমালায় মশার হাত থেকে বাঁচার উপায় বলেছিলাম।

ব্যাপারটা খুবই সোজা। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

প্রথমে পঞ্চাশ-ষাটটা মশা ধরতে হবে। ভয় পাবেন না, মশা ধরা, মশা মারার চেয়ে অনেক সোজা। ঘরের মধ্যে বিছানার কাছে একটা ফুটো মশারি টাঙিয়ে দেবেন। সেই মশারির মধ্যে কাউকে শুতে হবে না। কিন্তু ভোরবেলা দেখবেন মশারির মধ্যে বেশ কিছু মশা।

একটা কাঁচের বোতল নিয়ে এর মধ্যে যে ক'টা মশা সম্ভব ধরে ভেতরে পুরবেন। অনেক ধরতে পারবেন না, অনেক মরে যাবে। তাতে কিছু আসে যায় না। পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে বোতলে গোটা পঞ্চাশ মশা জমা পড়বে।

এবার বোতলের মধ্যে একফোঁটা আলতা ঢেলে ঝাঁকাবেন। এই আন্দোলনে কিছু কিছু মশা মরে যাবে। তা যাক।

বাকি যেগুলো জীবিত, জীবন্মৃত থাকবে, সেগুলো সন্ধ্যাবেলা ঘরে ছেড়ে দিন। এবার জীবনপণ লড়াই শুরু হবে লাল মশাদের সঙ্গে কালো মশাদেব। এরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে যাবে। আপনাদের কোন মশাই কামড়াবে না।

পরদিন সকালে দেখতে পাবেন ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে লাল ও কালো মশাদের অগুনতি মৃতদেহ।

শারদশশী



এই নিবন্ধে এ রকম নামকরণ শুধু নামের জন্যেই। হিমেল, নীল গগনে শরৎকালের মায়াবী চাঁদ, চাঁদ ও সাদা মেঘের ছেলেখেলা— শারদশশী নিয়ে লেখার জন্য এটাই প্রকৃষ্ট সময়।

কিন্তু পাঠক-পাঠিকা জেনে হতাশ হবেন, এই রচনা শারদশশী নিয়ে নয়, নিতান্ত নখ নিয়ে।

সেকালের বাঙালি কবি তাঁর নায়িকা বর্ণনায় প্রশ্ন তুলেছিলেন কে বলেছে তার মুখ শারদশশীর তুল্য, তার পায়ের প্রতিটি নখে একটি করে শারদশশী

আছে। নায়িকার রূপ বর্ণনায় প্রশংসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন কবি।

এবার আমাদের বক্তব্য বিষয় ওই নখ, এক রমনীর হাতের নখ।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের টেক্সাস প্রদেশের ডগলাস শহরে বসবাস করেন শ্রীমতি লরেটা আডমস। শ্রীমতি আডমসের বয়েস তেতাল্লিশ। ছবি দেখে মনে হয়েছে তিনি হৃষ্টপুষ্ট এবং কৃষ্ণাঙ্গিনী। প্রায় সিকি শতাব্দী আগে উনিশ বছর বয়সে তিনি হাতের নখ রাখা আরম্ভ করেন।

লরেটা মেমসাহেব ভেবেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘনখী হযে তিনি নাম করবেন, খ্যাতি পাবেন। এ বিষয়ে প্রধান সহায়ক হল, গুইনেস বুক অফ রেকর্ডস। এই বইয়ে মাথার চুল থেকে গালের গোঁফ-দাড়ি, ওজন-উচ্চতা সব কিছুর চূড়ান্ত রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা আছে। পৃথিবীতে কে সবচেয়ে লম্বা, কে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী, কার ওজন সবচেয়ে বেশি, কার গোঁফ, কার নখ দীর্ঘতম এই গুইননেস বই হল সেই সব হিসেবের রেকর্ড।

সেই রেকর্ড বইতে নাম তুলবার মানসে লরেটা আডমস এতকাল ধরে হাতের নখ না কেটে সেগুলো বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছে, তিনি বুঝে গেছেন গুইননেস বুক অফ রেকর্ডে তাঁর নাম ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এই বই থেকেই লরেটা জানতে পেরেছেন যে ভারতে এমন এক ব্যক্তি আছেন যাঁর হাতের নখগুলির দৈর্ঘ্য তাঁর নখগুলির দৈর্ঘ্যের চেয়ে ৭৬ ইঞ্চি বেশি।

অর্থাৎ লরেটা মেমসাহেবের গত পঁচিশ বছব ধবে এত যত্নে লালিত নখগুলির থেকে গড়ে প্রতিটি নখ সাড়ে সাত ইঞ্চি বেশি লম্বা।

আমার কাছে গুইননেস বুক অফ ওয়ার্লড রেকর্ডস ১৯৭৮ সালের সংস্করণ আছে। তখন অবশ্য সবাই এই রেকর্ড বইয়ের খবর রাখতো না। এখন তো হরবখত খবরের কাগজে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, অমুক গ্রামে একজন একটা ডিমের খোসার ওপরে একটা পুরো বাইবেল লিখে ফেলেছে। কিংবা অমুক শহরে একজন গত তিনমাস একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ সবই ওই বুক অফ রেকর্ডে নাম তোলার জন্যে। আমার ১৯৭৮ সালের সংস্করণে দেখছি, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নখের অধিকারী হিসেবে আমাদের এই কলকাতায় মুরারিমোহন আদিত্যের নাম ও ছবি ছাপা হয়েছে। মুরারিবাবুব বাঁ হাতের নখ গুলির মোট দৈর্ঘ্য সাড়ে সত্তর ইঞ্চি, তার মধ্যে দীর্ঘতম নখটি হল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে। যার দৈর্ঘ্য হল পনেরো ইঞ্চি। মজার খবর মুরারিবাবু তাঁর একেকটি আঙুলের নখের একটি একটি করে আলাদা নাম রেখেছেন।

জানি না মুরারিমোহন আদিত্যের নাম এখনও বুক অফ রেকর্ডসে আছে কি

না। তাঁর রেকর্ড হয়তো ইতিমধ্যে অন্য কেউ ভঙ্গ করেছে।

কিন্তু আমেরিকার ডগলাস শহরের শ্রীমতি লরেটা আডমস রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।

তিনি তাঁর পঁচিশ বছর ধরে কষ্ট করে যত্ন করে সাবধানে বাঁচিয়ে রাখা নখগুলো সব কেটে ফেলেছেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন রেকর্ড বুকে লম্বা নখের প্রতিযোগিতায় কস্মিন কালেও তাঁর নাম ওঠার সম্ভাবনা নেই।

গত দশ অক্টোবর তারিখে মনের দুঃখে ভদ্রমহিলা সব আঙুলের নখ কেটে ফেলে এখন ঝাড়া হাত-পা হয়েছেন।

নখ কেটে ফেলার পর লরেটা মেমসাহেব বলেছেন যে, 'হালকা হয়ে গেছি। গত পঁচিশ বছর নিজের শরীর চুলকাতে পারিনি। এখন নখ কাটার পর স্বচ্ছন্দে চুলকাচ্ছি।'

চাঁদা

আকাশে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি শুরু হয়ে গিয়েছে। কাশফুলের মেলা বসে গেছে কলকাতার পুরনো ময়দানে আর নতুন লবণহ্রদে। সেই অমল-ধবল দৃশ্যের বাৎসরিক ছবিও ছাপা হয়ে গেছে কাগজে।

ঢাকের বাদ্যি এখনও শহুরে বাতাসে ভেসে আসেনি। কিন্তু পুজো এসে গেছে। খবরের কাগজে, বেতারে, দূরদর্শনে সেল, সেল, সেল। ফুটপাথ নিয়ে হকার ও প্রশাসনের চোর-বুড়ি খেলা। আলুর দাম বাড়তে বাড়তে কমছে, কমতে কমতে বাড়ছে। এদিকে সারারাত শিশির পড়ছে। শহরতলীর গৃহস্থের উঠোনে টুপটাপ শিউলি ঝরে যাচ্ছে।

পুজোর মুখোমুখি চাঁদার খাতা ঘুরছে দরজায়-দরজায়। চাঁদা আদায়কারীরা আমাদেরই লোক, গোপালের দাদা, নেপালবাবুর ভাইপো কিংবা ভূপালদার শালা। পুজোর মুখোমুখি এদের চেহারাটা একটু পালটায়, একটু একরোখা হয়ে ওঠে, মহম্মদ আজহারউদ্দিনের মত শার্টের কলার উঁচু করে এদের সমবেত আগমন।

পুলিশ-প্রশাসন থেকে আপামর জনসাধারণের রাগ এদের ওপর। চাঁদার অত্যাচার নিয়ে খবরের কাগজে সম্পাদকীয়, সংবাদ। থানায় থানায় পুলিশের

নাগরিক সভা।

এরা কিন্তু নতুন নয়। গোপালের দাদা কিংবা নেপালবাবুর ভাইপো—এরা কিন্তু বহুকাল আছে। চাঁদা আদায় বহুকাল ধরে চলছে।

চাঁদা শব্দটি বাংলায় এসেছে ফরাসী 'চন্দ্' শব্দ থেকে। এই শব্দটি অতি পুরনো। বাংলা অভিধান বলছে, চাঁদা মানে হল, 'কোনও বিশেষ কার্য নির্বাহার্থে বহুজনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ।

চাঁদা অনেক সময়েই ঐচ্ছিক। যেমন লোকে পিকনিক পার্টির জন্য চাঁদা দেয়, পত্র-পত্রিকার জন্য বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা স্বেচ্ছায় ডাকঘরে গিয়ে লাইন দিয়ে মানি অর্ডার করে পাঠায়।

কিন্তু যেখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদা দিতে হয়, বিরক্তি, ভয় বা অপমানঘটিত সেই চাঁদা নিয়েই যত কোলাহল, যত গোলমাল।

এই গোলমাল বহুকালের পুরনো।

বৌদ্ধ জাতক কাহিনীতে চাঁদার কথা দেখা যায়। জাতকে ছন্দকের কথা আছে, যার অর্থ হল, 'ইচ্ছা পূর্বক যাহা দেয়।' এই প্রাচীন ছন্দক এবং পারসিক চন্দ্ বোধহয় একই শব্দ, যার আধুনিক রূপ চাঁদা।

সুসীম জাতকে চাঁদার কথা বলা আছে। সমস্ত নাগরিক একসঙ্গে চাঁদা তুলে দানের বা উৎসবের বন্দোবস্ত করতেন।

সেই আমলেও এই চাঁদা তোলা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ, কলহ-কোলাহল কিছু কম ছিল না।

সুসীম জাতক (১৬৩) দেখলে চোখে পড়ে, চাঁদা দিয়ে কেনা জিনিস তীর্থযাত্রীদের দেওয়া হবে নাকি বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেওয়া হবে তাই নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল। অবশেষে এ ব্যাপারে রীতিমত জনমত যাচাই করা হয়। সকলের মত নিয়ে দেখা গেল বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘকে দেয়াই অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা।

এসব প্রাচীন কাহিনীর শেষে এবার একটি আধুনিক চাঁদার কাহিনীতে যাচ্ছি।

শহরতলীর বাসরাস্তার জমজমাট মোড়। আশ্বিনের সন্ধ্যায় ঝলমল করছে আলোয়, বিজ্ঞাপনে।

রাস্তার পাশে একটি বট গাছের তলায় ফেস্টুন টাঙিয়ে কয়েকটি যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে, ফেস্টুনে লাল শালুতে সাদা হরফে লেখা।

'দেবীর আরাধনায়
প্রতিবন্ধী যুবকদের মুক্ত হস্তে
সাহায্য করুন।'

যুবকদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে চাঁদার খাতা। রাস্তা দিয়ে যেই যাচ্ছে,

বাস থেকে যেই নামছে রশিদ বই হাতে দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকাচ্ছে।

আমাকেও আটকিয়েছিল। কিন্তু চাঁদা তোলার ব্যাপারে আমি পুরনো পাপী, ওদের ওই ফেস্টুন দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। মনের ভাব গোপন না করে প্রশ্ন করলাম, 'আপনাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী কে? কাউকেই তো প্রতিবন্ধী দেখছি না।'



যুবকদের নেতা এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'দাদা,আমরা কি সাধারণ প্রতিবন্ধী? আমরা হলাম অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধী। অর্থনৈতিকভাবে সাংঘাতিক পঙ্গু।

বলাই বাহুল্য

একেকজন লোক একেক সময় এমন একটা কথা বলে যে শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আমাদের পাড়ায় একটা ছেলে সাইকেলে করে গলিতে গলিতে ঘুরে মাছ বেচে। সে সুযোগ পেলেই নরম মাছ গছাবার চেষ্টা করে। তাই নিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে বাদ বিসম্বাদ হয়।

তা এই ছেলেটি বছর খানেক আগে বিয়ে করেছে। সম্প্রতি তার একটি মেয়ে হয়েছে। আজকে সে যখন মাছ বেচতে এসেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়ে কেমন হয়েছে?'

ছেলেটি বলল, 'ভাল স্যার। একেবারে টাটকা, খুব তাজা।'

মাছের পর মাংসের গল্প বলি।

আমার ছোটভাই বিজন একবার নিউমার্কেটে মাংস কিনতে গিয়ে খালি থলে হাতে ফিরে এল। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাংস কি হল?'

বিজন দুঃখিত ভাবে বলল, 'মাংস পাওয়া গেল না।'

'সে কি? নিউমার্কেটে মাংস নেই?' আমরা অবাক। এর পরে বিজন যা বলল তাতে অবশ্য আরও অবাক হলাম।

বিজন বলল, 'পাঁঠা-খাসিরা স্ট্রাইক করেছে।' আমরা তো স্তম্ভিত, পাঁঠা-খাসিদের স্ট্রাইক, সে আবার কি? এ অধিকার তাদের কে দিয়েছে?

পরে অবশ্য খবরের কাগজ পড়ে এবং বাজারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি হগ মার্কেটের বাজার কর্তৃপক্ষের কি এক নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাজারের মাংস বিক্রেতারা ধর্মঘট করে দোকান বন্ধ রেখেছে।

'পাঁঠারা স্ট্রাইক করেছে', বলাই বাহুল্যের চমৎকার উদাহরণ। তবে এ বিচারে সবচেয়ে চমৎকার গল্প বনফুলের।

এই গল্পটির কথা আমি অন্য জায়গায় বিশদ করে বলেছি। সুতরাং এবার একটু সরে গিয়ে অন্যরকম করে বলছি।

দুই ব্যক্তি। বলাই আর কানাই। দুজনেই একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে।

বলাই রোগা, বলাইয়ের গায়ের রঙ কালো, বলাই বেঁটে, বলাই বি.এ. ফেল।

কানাই স্বাস্থ্যবান, কানাইয়ের গায়ের রঙ ফর্সা, কানাই লম্বা, কানাই এম. এ., ডক্টরেট।

বলাই একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে।

কানাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে।

বলাই বিরহের কবিতা লেখে। ছোট্ট ছোট কবিতা।

কানাই প্রেমের উপন্যাস লেখে। বড়-বড় উপন্যাস।

আর তালিকা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। অল্প দিনের মধ্যে বলাই বাহুল্য।

এই গল্পটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, গল্পটির লেখক বনফুল। স্মরণ করা যেতে পারে যে বনফুলের নাম ছিল বলাই, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

অবশেষে একটা ঘরের কাছের উদাহরণ দিচ্ছি।

আমাদের পুরনো পাড়ায় বাজারের পাশে ছিল সুপ্রাচীন 'আইডিয়াল টি স্টল'।



সকাল-বিকাল দু'বেলাই দোকানটায় বেশ ভিড় হত। বিশেষ করে সকাল বেলায়, যারা বাজারে যেত অনেকেই আইডিয়াল থেকে এক কাপ চা খেয়ে নিত। খুব ভিড় হলে আমরা অনেক সময় পেয়ালা হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খেয়ে নিতাম।

আইডিয়ালে সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল, হয়ত এখনো তাই আছে, চায়ের অর্ডার দিয়ে দাঁড়াতে হত না। সকাল বেলাতেই এক গামলা চা তৈরি করে তাতে দুধ চিনি মিশিয়ে দুটো বিশালাকার অ্যালুমিনিয়াম কেটলিতে রেখে দেওয়া হত। অবশ্য শেষের দিকে একটা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

একবার এক অচেনা ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, ওই জুড়নো চায়ে এক চুমুক দিয়ে আইডিয়াল মালিক গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটা কি চা?'

গোপীবাবু বলেছিলেন, 'আসল দার্জিলিং চা।'

ভদ্রলোক চায়ের পেয়ালাটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'ও দার্জিলিং বুঝি! তাই এত ঠাণ্ডা!'

আজ কি কাজ

আমি একজন আমলাকে চিনতাম। তিনি অফিসে এসে প্রথমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর এক গেলাস জল খেতেন।

ইতিমধ্যে চা এবং খবরের কাগজ আসতো। সেগুলোর পালা শেষ হলে ভদ্রলোক ড্রয়ার খুলে একটা লিখবার প্যাড বার করতেন। তারপর পকেট থেকে কলম বার করে অনেকক্ষণ ধরে সযত্নে গোটা গোটা অক্ষরে লিখতেন।

আজ কি কাজ?

এরপর অনুরূপ পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে তিনি চেয়ার থেকে উঠে ঘরের পেছন দিকে পর্দার আড়ালে আরাম কেদারায় শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

কিছুক্ষণ পরে ওই আরাম কেদারা থেকে উঠে তিনি বাথরুমে যেতেন। তারপর বাথরুম থেকে ফিরে এসে আবার কাজের চেয়ারে বসতেন। তারপর কলম খুলে বেশ কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগ সহকারে একটু আগে প্যাডের ওপরে ওই যে 'আজ কি কাজ?' লিখেছিলেন, সেই পংক্তিটা পর্যবেক্ষণ করতেন।

এইভাবে পর্যবেক্ষণ অনেকদিন একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা লেগে যেত। তারপর তিনি ধীরে সুস্থে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় কাজের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি কেটে দিতেন।

এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটি কেটে ফেলার পরে আরও বেশ কিছুক্ষণ যেত।

অবশ্য এর পরেও যে বাক্যটি আর সংশোধন হত না তা নয়।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে খুব উত্তেজিত হয়ে তিনি 'কি' কেটে 'কী' লিখতেন। যেদিন বেশি পরিশ্রম করার ঝোঁক থাকত, সেদিন 'আজ কি কাজ?' পুরো বাক্যটি কেটে দিয়ে 'আজ কী কাজ' লিখতেন।

এবার আরাম কেদারায় আবার কিঞ্চিৎ বিশ্রাম এবং চা পান। আবার একবার খবরের কাগজের পাতাগুলো ওল্টানো। ইংরেজি, বাংলা কোনও ম্যাগাজিন এসে থাকলে সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখা।

ইতিমধ্যে এদিক-ওদিক থেকে দুয়েকটা তলব এসে যায়। দু'চারটে চিঠিপত্র, নথিও আসে। ভদ্রলোক সেগুলো ফেলে রাখেন না। সঙ্গে সঙ্গে সই করে দেন।

পাশাপাশি চলে 'কি' এবং 'কী' এই দুইয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কখনও 'কি' কেটে 'কী' হয়। কখনও 'কী' কেটে 'কি' হয়। এরমধ্যে আবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়েও নানা জিজ্ঞাসা।



ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েন। টিফিনের সময় হয়েছে, তিনি বাড়ি থেকে নিয়ে আসা টিফিনের বাক্স খুলে টিফিন করেন। তারপর বাথরুম, আরামকেদারা, খবরের কাগজ, অবশেষে কাজের চেয়ার। আবার কঠোর পরিশ্রম, কি বনাম কী। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার সময় ভদ্রলোক প্যাডের নিচে লিখে যান, 'কাল কি কাজ'!

কুকুর

কুকুরের গল্প বিলেত থেকেই শুরু করি। আমাদের দেশী হিসেব অনুযায়ী কুকুর দু-রকমের, নেড়ি কুকুর আর বিলিতি কুকুর। তা সে যে রঙের, যে আকারের, যে চেহারারই হোক না কেন, নেড়ি নয় এমন সব কুকুরই আমাদের চোখে বিলিতি কুকুর। ছোট ল্যাপডগ সেও বিলিতি কুকুর, বিশাল অ্যালসেশিয়ান বা গোল্ডেন রিট্রিভার, সেও বিলিতি কুকুর।

আমাদের পণ্ডিতিয়ার বাসায় দুটো কুকুর ছিল। তাদের কথা অনেকেই জানেন, হয়তো ডোডো-তাতাই গল্পমালায় পড়েছেন। সেই কুকুর দুটির একটা থাকতো গৃহে, অন্যটি স্থানাভাবের জন্য রাস্তায়।

প্রথম কুকুরটি যেটা ঘরে বা রুমে (Room) থাকতো সেটাকে আমরা বলতাম রুমানিয়ান ডগ। আর যেটা Road মানে রাস্তায় থাকতো, সেটাকে বলতাম রোডেশিয়ান ডগ। বলা বাহুল্য, আমাদের এই নামকরণ বিশ্বাসযোগ্য না হয়েও জনপ্রিয় হয়েছিল।

পরবর্তীকালে আমাদের অন্য একটা কুকুর, গণেশ নাম ছিল তার, বেশ বিখ্যাত হয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে একটা উপন্যাস এবং একাধিক গল্প লিখেছি।

গণেশ আমাদের বাড়িতেই জন্মেছিল। তার জননী চিলিকে আধা চোখ-ফোটা শৈশবে আমরা গঙ্গাতীরে ফোর্টের সামনে বেদেদের কাছ থেকে কিনেছিলাম।

চিলি বেশিদিন বাঁচেনি, বোধহয় বছর পাঁচেক হবে। তবে গণেশ দীর্ঘজীবী হয়েছিল, প্রায় পনেরো বছর বেঁচেছিল।

এই গণেশের গলার বকলেসেই আমি বিখ্যাত বিলিতি কবিতা থেকে নকল করে একটা ছোট প্রশ্নবোধক বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে দিয়েছিলাম, সেই বিজ্ঞপ্তির বয়ান

ছিল এইরকম—

আমি মশায়,
পণ্ডিতিয়ার
তারাবাবুর কুকুর।
আপনি মশায়
কোথাকার
কোনবাবুর কুকুর?

গণেশের কথা হাসির ছলে বলতে গিয়ে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার দীর্ঘ দেড় দশকের জীবনের সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের অনেক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার দিন জড়িয়ে আছে।

পোষা কুকুরের কাহিনী নয় এবার সত্যিকারের গল্পে যাই।



এক মেমসাহেব কুকুর কিনতে পেট শপে (Pet Shop) গিয়েছেন। অনেক বাছাবাছি করে একটি কুকুরছানা পছন্দ করে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা খুব প্রভুভক্ত কুকুর হবে তো?'

দোকানদার হাসিতে বিগলিত হয়ে বললেন, 'আপনাকে আর কি বলব, এই কুকুরটা এত বেশি প্রভুভক্ত যে তিনবার বেচেছি, আর তিনবারই মালিকের

বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে।'

যা দেবী

যা দেবী সর্বভূতেষু
বিদ্যারূপেন সংস্থিতা

আজ এই শ্রীপঞ্চমীর দিনে আমি আমার পাঠিকাদের স্মরণ করছি, অঞ্জলি নিবেদন করছি,

যা দেবী সর্বভূতেষু
পাঠিকারূপেন সংস্থিতা।

পাঠিকারাই আমার লক্ষ্মী, পাঠিকারাই আমার সরস্বতী। তাঁরাই আমার লেখা পড়েন, তাঁরাই আমার বই কেনেন। তাঁরাই আমার আড়াই-মণি দেহের জন্যে খাদ্য-পানীয়ের খরচের যোগান দিচ্ছেন। তাঁদেরই দৌলতে শীর্ণ সমালোচক আর স্থূল অধ্যাপকদের বক দেখিয়ে করে খাচ্ছি।

কিন্তু আমি নিজেও টের পাই সব সময়ে লেখা জমছে না। কখনো তাড়াতাড়ি থাকে, কখনো অযত্ন থাকে, বহু সময়ে পুনরাবৃত্তি থাকে।

গত কয়েক সপ্তাহ চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরেছি। কোথায় ওড়িশা, কোথায় হায়দরাবাদ, আব কোথায় বা মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চল। এ দিকে কলকাতায় বইমেলা, সামনের মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশে জাতীয় কবিতা উৎসব।

ফলত লেখাপড়া মাথায় উঠেছে। সেইসঙ্গে মাথায় উঠেছে বাক্স, বিছানা। ঘুমের ওষুধ, হজমের ওষুধ, হাঁচিকাশির ওষুধ - বিদেশ বিভূঁয়ে কখন কি হয় কে জানে।

ফলে লেখা নিয়ে যথেষ্ট গড়িমসি হয়েছে। সুখের বিষয় সম্পাদক নন আমার গড়িমসি টের পেয়েছেন আমার শুভানুধ্যায়িনী পাঠিকারা।

ঘরের কাছে সাঁতরাগাছি থেকে শ্রীমতী সোনালি ভাদুড়ি একটি চিঠি দিয়ে বলেছেন, 'কি হল আপনার? এ সব কি হচ্ছে?'

'এই নিন আপনাকে একটা চমৎকার রসিকতা উপহার দিচ্ছি। খুব ভালভাবে ব্যবহার চাই।'

শ্রীমতী ভাদুড়ি প্রেরিত রসিকতাটি একটু লম্বা-চওড়া, আমি প্রয়োজনানুসারে

ছাঁটকাট করে উপস্থাপন করছি।

শ্রীমতীর দুটি সন্তান, বড়টি ছেলে, ছয় বছর বয়েস। ছোটটি মেয়ে আড়াই বছর বয়েস।

একদিন সকালে দুই ভাই-বোনে বাইরের ঘরে খেলা করছে, সোনালি রান্নাঘরে রান্না করছে, এমন সময় অগ্রজ পুত্রটি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রান্নাঘরে ছুটে এল।



সোনালি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

পুত্র বলল, 'বোন আমার চুল টেনে দিয়েছে।'

সোনালি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এই জন্যে কাঁদছো? তোমার অতটুকু বোন, সে কি জানে চুল টানলে লাগে, কষ্ট হয়।'

বুদ্ধিমান পুত্র চোখের জল মুছে আবার বাইরের ঘরে খেলতে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই সব গোলমাল হয়ে গেল। আবার ব্যাকুল ক্রন্দন, বাইরের ঘরে। শুধু ব্যতিক্রম এই যে এবার ছোট মেয়েটি প্রাণপণ কাঁদছে।

সোনালি গ্যাস স্টোভ থেকে কড়াই নামিয়ে, গ্যাস বন্ধ করে বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে দেখলেন কন্যা হা হুতাশে কাঁদছে আর ছেলেটি একটু দূরে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনালি বাইরের ঘরে ঢুকে কঠোর দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে? কেন বোন কাঁদছে?'

ছেলে বলল, 'তুমি বলেছিলে না, ও জানে না চুল টানলে কেমন লাগে, সেটা ওকে শিখিয়ে দিলাম।'

চিঠি

অল্প কিছুদিন আগে, ১৯৯৭ সালে একটি পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের অবিভক্ত বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র গ্রামের একটি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের যুবক পোস্টমাস্টারকে নিয়ে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছি।

উপন্যাসটি কেমন হয়েছে, পাঠক-পাঠিকারা সেটা বিবেচনা করবেন, কিন্তু আমার বিপদ হয়েছে সেই থেকে চিঠিপত্রের ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

এই ঘুরঘুরানি গত পরশুদিন থেকে আরও বেড়ে গেছে একটি ভয়াবহ কারণে। আমি এখন কলকাতার যে অঞ্চলে থাকি, মানে সল্টলেক (লবনহ্রদ) উপনগরীতে, সেখানে ডাকসেবা অতি আদিম পর্যায়ের। আমার বাড়ির দেড়-দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোন ডাকঘর নেই। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র ডাক বাক্স ছিল বাসরাস্তার মোড়ে, স্থানীয় বাজারের সামনে। গত সপ্তাহে কে বা কারা যেন চিঠিপত্র সমেত এই ডাকবাক্সটি চুরি করে নিয়ে গেছে। পার্কের রেলিং চুরি হওয়া, রাস্তার ম্যানহোল চুরি হওয়া আজকাল এসব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ডাকবাক্স চুরি যাওয়া অকল্পনীয়।

এই বাস্তব অবস্থাটুকু বলার পর মুহূর্তে খেয়াল হচ্ছে যে অভিযোগ বা রাগের কথা সাতকাহন করে বলা উচিত নয়। অথচ চিঠির মত বিষয়ে নতুন মজাদার ঘটনাই বা কোথায় পাই।

সুতরাং সেই চর্বিত-চর্বনই করতে হচ্ছে।

প্রথম গল্পটা গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত ছিল। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের রঙ্গ কথাতেও পেয়েছি। অনেক খ্যাতনামা বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যাঁদের হাতের লেখা খারাপ, অপাঠ্য, তাঁদের নিয়েও অনুরূপ গল্প প্রচলিত।

এই ভদ্রলোক একদিন দুপুরে বাসায় বিছানায় শুয়ে আছেন, এমন সময়ে

তাঁব বৃদ্ধা পিসিমা এলেন তাঁর কাছে।

পিসি-মাসি, মা-দিদিমাবা কেউ টের পান না কিংবা তোয়াক্কা করেন না যে তাঁদের বাচ্চু কিংবা খোকনের বয়স বেড়েছে, সে এখন গন্যিমান্যি ব্যক্তি।

আজ দুপুরে পিসি ভাইপোর কাছে এসেছেন একটি পোস্টকার্ড নিয়ে, চিঠি লেখাতে। আর কাউকে দিয়ে চিঠি লেখানোয় তাঁর আস্থা নেই। এবং বশংবদ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান খোকন পিসির অনুরোধ সহস্র কাজের মধ্যেও চিরকাল রক্ষা করেছেন।

কিন্তু আজ পিসি যখন একটা পোস্টকার্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খোকন, একটা চিঠি লিখতে হবে।' তখন খোকনবাবু বললেন, 'পিসি, চিঠি লিখতে আমি পারব না।'

পিসি অবাক, 'কেন?'

খোকন বললেন, 'তুমি জানো না? আমার পা মচকিয়ে গেছে। চলাফেরা করতে পারছি না। অফিস না গিয়ে দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে আছি।'

পিসি বললেন, 'তোর পা মচকিয়েছে তাতে কি হয়েছে? তুই তো চিঠি লিখবি হাত দিয়ে।'

খোকন বললেন, 'কিন্তু আমার লেখা চিঠি পড়বে কে? আমার হাতের লেখা তো কেউ বুঝতে পারবে না। আর আমি তো ভাঙা পায়ে গিয়ে চিঠি পড়ে দিয়ে আসতে পারব না।'

অবোধ্য কিংবা অপাঠ্য চিঠির বিষয়ে অবশ্য একটি সত্য কাহিনী আছে, সরল এবং নিষ্পাপ কাহিনী।

একটি বছর তিনেকের শিশু সাদা কাগজ আর ডটপেন নিয়ে ঘরের মেঝেতে বসে তাঁর বিদ্যা বুদ্ধিমত অ আ ক খ, A B C D ইত্যাদি হিজিবিজি কাটছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গুণ্ডা, এটা কি করছ?'

বলতে ভুলে গেছি, শিশুটি আমার বন্ধুপুত্র, তাঁর গুণ্ডা নামকরণ করেছেন তাঁর স্নেহময়ী পিতামহী।

তা, আমার প্রশ্ন শুনে গুণ্ডা সগৌরবে ঘোষণা করল, 'একটা চিঠি লিখছি।'

আমি বললাম, 'কাকে চিঠি লিখছ?'

গুণ্ডা বলল, 'মাফিয়াকে।'

অনুমান করতে পারলাম, আশেপাশের আর কোন শিশুকে তার স্নেহময়ী/ স্নেহময় অভিভাবিকা/ অভিভাবক মাফিয়া নামকরণ করেছেন।

কিন্তু আমার প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি।

আমি গুণ্ডাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'তুমি এসব হিজিবিজি কি লিখেছ? তুমি

লিখতেও পার না, পড়তেও পাব না। এ চিঠি মাফিয়া কি কবে পডবে?'



গুণ্ডা বলল, 'মাফিয়াও লিখতে পড়তে জানে না।'

পরের চিঠিটাও একই রকম।

পার্থক্য শুধু কোন শিশু নয় এ চিঠিটা লিখছেন এক পাগল।

যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন পাগল আর শিশুতে খুব একটা পার্থক্য নেই। পুরনো বাড়ির, এই পুরনো পাগল, ভাঙা দালানের দক্ষিণের বারান্দায় পূর্বমুখী একটা তক্তাপোষে বুকে বালিশ দিয়ে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখছিলেন। সারা দুপুর প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চিঠিটা তিনি লিখলেন, তারপর চিঠিটা উলটিয়ে-পালটিয়ে আদ্যোপান্ত নিজের লেখা চিঠিটা তিনি বেশ কয়েকবার পড়লেন।

তারপর একটা খামের মধ্যে চিঠিটা পুরে সেই খামের ওপরে নিজের নাম-ঠিকানা খুব যত্ন করে ভরলেন।

এই অপ্রকৃতিস্থ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'চিঠিতে কি লেখা আছে?'

তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'এখন কি করে বলব? আগে চিঠিটা আসুক। খুলে পড়ি। তাবপর বলতে পারব।'

হাওয়া কেমন



সম্পাদক মহোদয় বললেন, 'হাওয়া কেমন বুঝছেন?'

আমি সাধারণত সম্পাদকদের এড়িয়ে চলি। সব সম্পাদকেরই কেমন একটা মাস্টার-মাস্টার ভাব, সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করেন, এমন প্রশ্ন যার উত্তর তিনি মোক্ষম জানেন, অন্যকে প্রশ্ন করা শুধু তাকে যাচাই করার জন্য।

এ ক্ষেত্রেও সম্পাদক বোধহয় আমাকে একটু যাচাই করতে চাইছেন। তবু পরিষ্কার বুঝবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম কোন হাওয়ার কথা বলছেন?

সম্পাদক মৃদু হেসে বললেন, 'এখন তো একটাই হাওয়ার খোঁজ চলছে, ভোটের হাওয়া, কেমন বুঝছেন আপনি?'

আমি বললাম, 'আমি আর কি বুঝব, এটা তো ঠিক আমার বিষয় নয়?'

আমার কথা শুনে সম্পাদক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বললেন, 'যাদের বিষয় নয় তাদের দিয়েই ভোট নিয়ে লেখাবো। আপনি একটু বেড়িয়ে পড়ুন, এদিক-ওদিক খোঁজখবর নিন। আপনাকে দিয়ে 'ভোটের হাওয়া' শুরু করে দিচ্ছি।'

হাওয়া ব্যাপারটা খুবই জটিল। কখন যে কোথায় কিসের হাওয়া ওঠে বোঝা কঠিন। অনেক সময় যখন হাওয়া ওঠার কথা তখন হাওয়া ওঠে না। সপ্তমী, অষ্টমী কেটে যাওয়ার পর নবমীব সন্ধ্যায় ওঠে পুজোর হাওয়া। বড়দিনের পরদিন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় পার্ক স্ট্রিট।

সে যা হোক, সম্পাদককে আমি বলি যে, 'রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু লেখা আমার গুরুর বারণ আছে।' সম্পাদক বললেন, 'আপনি রাজনীতি না করেই ভোটের হাওয়ার কথা লিখুন।'

কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব?

কলকাতা শহরে বসে তো ভোটের হাওয়া বিশেষ টের পাওয়া যাবে না। এখানে জনমত বোঝা খুব কঠিন, চেষ্টা করলে অন্তরঙ্গভাবে দুয়েকটা নির্জনমত হয়ত সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তাতে ভোটের হাওয়া টের পাওয়া যাবে না। তার জন্যে যেতে হবে মফঃস্বলে।

গতকাল হাবরায় গেলাম। হাবরা-বাণীপুর। বাণীপুরে এই সময় লোক উৎসব এবং মেলা হয়। বছর বছর যাই। আজ প্রায় চল্লিশ বছর ওই অঞ্চলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে জীবিকার জন্যে পাশেই কল্যাণগড়ে এসেছিলাম, সেই থেকে সেখানকার মাটি ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ।

কালকের দিনটি ছিল চমৎকার। সুন্দর ঝলমলে রোদ উঠেছে। কয়েকদিন আগেই গেছে বসন্ত পঞ্চমী। শীতের বাতাসে এখন আর তেমন ধার নেই। ফাল্গুন মাস প্রায় এসে গেছে।

গাড়িতে যেতে যেতে পুরনো দিনের একটা নির্বাচনিক কবিতা মনে পড়ল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই কবেকার কবিতা : —

'ফাল্গুনে অথবা চৈত্রে
বাতাসের দিক বদলাবে।'

আগে ফাল্গুনেই ভোট হত। ফেব্রুয়ারির শেষে মার্চের প্রথমে, লোকসভা-বিধানসভাএকসঙ্গে। '৬৭ সাল পর্যন্ত চারটে নির্বাচন এভাবেই চলেছে। তারপর ভোটের সময় আর ঠিক থাকেনি।

রাস্তায় তিন চারবার গাড়ি দাঁড় করিয়ে চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। যদি লোকজনের কথাবার্তায় কিছু আঁচ পাই। কিন্তু ভোট নিয়ে কেউ কোন কথা

বলছে না। লোকে পেঁয়াজের দাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। বাণীপুর মেলায় মৃত্যুকূপে চারটে মটর সাইকেল আর একটা মারুতি বিদ্যুৎবেগে ওঠানামা করছে। সেই রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর খেলা নিয়ে সবাই চিন্তিত, যারা খেলাটা দেখে এসেছে তারা তো বটেই, যারা দেখেনি তারাও খুব বিচলিত।

সামনের দেয়ালে দুই ব্যক্তি বাঁশের ভারায় উঠে বড় বড় করে নির্বাচনী প্রতীক আঁকছে। সে বিষয়ে চায়ের দোকানের সকলেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

গতবছর এ সময়ে এ অঞ্চলে গাছে গাছে অজস্র আমের মুকুল দেখেছিলাম। এবার প্রায় কোন গাছেই এখনও বোল আসেনি। যা দুয়েকটা এসেছে তাও খুব কম। বাণীপুরে ঢোকার রাস্তার মুখে নেমে একটা পানের দোকান থেকে একটা পান খেলাম। আমার সামনেই একজন মুরুব্বি গোছের লোক নারকেলের দড়ি থেকে বিড়ি ধরাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার কি আম কম হবে?'

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'জানেন না, ভোটের বছরে ধান-পান-আম কম হয়।'

জানি না। জানতাম না। এরকম একটা হেঁয়ালি যে থাকতে পারে তাই জানতাম না।

মেলার জায়গার একটু পরেই আমার বহু পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ি। সে বাড়িতে একবার গেলাম। চা খেতে খেতে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভোটের অবস্থা কেমন বুঝছেন?'

তিনি বললেন, 'কোন হাওয়াই এখনও ওঠেনি।' তাঁর স্ত্রী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'কি করে উঠবে? যে আসছে তুমি তাকেই বলছ, আপনাদেরই ভোট দেব।' ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দিনকাল খারাপ, সবাইকেই খুশি রাখতে হয়।'

খুশি-অখুশির ব্যাপার নয়। সব জায়গাতেই ভোটের ব্যাপারটা কেমন যান্ত্রিক হয়ে গেছে। উদ্দীপনা, উন্মাদনা প্রায় কিছুই চোখে পড়ছে না। হয়ত শেষের দিকে হাওয়া উঠবে, খুব জোর হাওয়া কিছু উঠবে, এমন বলা কঠিন।

কোন চোরাস্রোতের খোঁজ পেলাম না যাতে বলতে পারি,
ফাল্গুনে অথবা চৈত্রে
ভোটারেরা দিক বদলাবে।

পুনশ্চ : অবশেষে ফিরে আসার মুখে একটা ভোটের মিছিল গেল। নেমে

শুনি দুই বৃদ্ধের কথোপকথন : —

১ম বৃদ্ধ : আমি পার্টি-টার্টি জানি না। সবসময়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোট দেই।

২য় বৃদ্ধ : ভোট গোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কি করে বোঝো কোন্ প্রার্থী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি?

খাদ্য সমস্যা

খাদ্য সমস্যা নিয়ে নিবন্ধ রচনার অনুরোধ আমার কাছে আসতে পারে এ কথা আমি কখনো ভাবিনি।

দেশ ও সমাজের খাদ্যের সমস্যা, সে অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। নাবালক বয়সে পঞ্চাশের মহামন্বন্তর দেখেছি, ষাট বছরের জীবনের পঞ্চান্ন বছর রেশনের তণ্ডুল খেয়ে জীবন ধারণ করছি। খাদ্য সমস্যা কাকে বলে সেটা আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি। কিন্তু তা নিয়ে নিবন্ধ রচনার যোগ্যতা আমার নেই। মাস মাইনের 'নুন-আনতে-পান্তা ফুরোয়' সংসারের খাদ্য সংগ্রহ করতে উচাটন হয়ে আছি সারা জীবন। আমাকে কি না খাদ্য সমস্যা নিয়ে লিখতে বলা!

কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম। টেলিফোনের অপর প্রান্তে অনুরোধকারিণী তাঁর সুললিত কণ্ঠে বললেন, 'না। না। খাদ্য সমস্যার মতো জটিল ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আমরা মাথা ঘামাতে বলছি না। সে জন্য ভাল ভাল লোক আছে। আপনি বরং হালকা করে লিখুন দেশে, বিদেশে, ঘরে, বাইরে খাদ্য নিয়ে আপনার নিজের কখনও কোনও সমস্যা হয়েছে কি না?'

আমি বললাম, 'তা বহুবার হয়েছে। পয়সার অভাবে সুখাদ্য কিনতে পারিনি। সে অসুবিধে এখনও নিয়মিত হয়।'

অনুরোধকারিণী তরল হাসিতে আমার অক্ষমতা ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্যাঁচালো কথা মোটেই নয়। আমি জানি আপনি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছেন আমরা কি বিষয়ে কি ধরনের লেখা আপনার কাছে চাইছি।'

* * *

অগত্যা আমি যেমন বুঝেছি তেমনই লিখছি।

কলকাতা দিয়েই শুরু করি। বড় হোটেলের পশ্ রেস্তোরাঁগুলো বাদ দিলে উত্তরে শ্যামবাজার পাঁচমাথার গোল বাড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণে সুতৃপ্তি,

পানীয়ন পর্যন্ত এমন কোনও উল্লেখযোগ্য রেস্তোরাঁ নেই যেখানে আমি আমার এই মহামূল্য জীবনের অমূল্য দু দশ ঘণ্টা ব্যয় করিনি।

আমার পাইস হোটেলের অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়।

একক অবিবাহিত জীবনে আমাদের সাবেক কালীঘাটের বাড়িতে আমাদের রাঁধুনি রাধাদিদি পাগল হয়ে যান। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি ধোবানি। রান্নাবান্না ছেড়ে সেই রাধাদিদি সকাল-সন্ধ্যা কাপড় কাচতেন। সকালবেলা উঠে কর্পোরেশনের গঙ্গাজলে আলনার সমস্ত জামাকাপড়, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, এমনকি শতরঞ্চি, পাপোশ পর্যন্ত যা কিছু হাতের কাছে পেতেন সব কাচতেন। দুপুরে ছাদে সেগুলো শুকতো। আবার সন্ধ্যাবেলা সেগুলো কাচা হত। জামাকাপড় ছাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে কাচা হয়ে যেত। তখন আমি বহুদিন এক বস্ত্রে এবং পাইস হোটেলে খেয়ে কাটিয়েছি।

রাধাদিদি, তিনি আবার নিজের নাম বলতেন আধা আনি (রাধারানী), বহুকাল গত হয়েছেন, তাঁকে নিয়ে উপন্যাস লিখব। আপাতত ফরমায়েসি খাদ্যের গল্প।

কলকাতার আর হাওড়ার রেস্তোরাঁর দুটি স্মরণীয় ঘটনা, পুরনো ব্যক্তিগত কাহিনী, তবু আরেকবার বলি।

ধর্মতলায় একটা প্রাচীন চায়ের দোকানে, (অধুনা অবলুপ্ত) একবার চা খেতে গিয়েছিলাম। স্রেফ চা। কিন্তু মাংসের ঝোল আর হলুদের দাগ লাগা ময়লা অ্যাপ্রন পরা বেয়ারা নাছোড়বান্দা। ঘর্ম মলিন, জীর্ণ প্রায় একটা মেনু এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, কিছু খাবেন না।'

মেনুটা তার হাতের থেকে নিতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, বেয়ারাটির হাতের আঙুলে কেমন চাকা-চাকা দাগ। ঘায়ের মত। সভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার কি একজিমা আছে?'

লোকটি লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'না স্যার। একজিমা হবে না। ফিশ ফ্রাই হবে, কাটলেট হবে।'

কাটলেটের প্রসঙ্গে অন্য অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বলি।

ঘটনাটা বহুকাল আগের, ঘটেছিল হাওড়ার রেলওয়ে রিফ্রেসমেন্ট রুমে। একটা কাটলেটের অর্ডার দিয়েছিলাম। যথারীতি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে সেই কাটলেটটি এল, বেশ বড় সাইজের।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাজার রকম চেষ্টা করেও, শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও কাটলেটটি ছুরি কাঁটা দিয়ে কাটতে পারলাম না। তখন বাধ্য হয়ে বেয়ারাকে ডাকলাম। সে এলে অবিভক্ত কাটলেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম এর দ্বারা হবে না।

তখন বললাম, 'যাও ম্যানেজারবাবুকে ডেকে নিয়ে এসো।'

অম্লান বদনে বেয়ারাটি জবাব দিল, 'ম্যানেজারবাবুও এ কাটলেট খেতে পারবেন না।'

খেপে গিয়ে বললাম, 'তুমি ওই কাটলেট ফেরত নিয়ে যাও।'

লোকটি অনেকক্ষণ ধরে উলটিয়ে-পালটিয়ে, খুব অভিনিবেশ সহকারে কাটলেটটি পর্যবেক্ষণ করল, তারপর বলল, 'এটা ফেরত হবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

লোকটি বলল, 'আপনি এটা বেঁকিয়ে ফেলেছেন।'



হাসির গল্প নয়। অন্য দশজনের মতই আমার এই জীবনে উলটোপালটা খাবারের মুখোমুখি হতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

অবশ্য উলটো-পালটাই বা বলি কী করে? ইলিশ মাছের কাঁটা দিয়ে কচুশাক আমার কাছে পরম উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু কোনও শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গিনীকে এ জিনিস দিলে স্পর্শ করতেও সাহস পাবে না। ছোটবেলায় দেশের বাড়িতে ঢ্যাপের মোয়া খেয়েছি। অসামান্য সুখাদ্য। ঢ্যাপ হল, শালুকের বিচির খই। পদ্মবিচির খইয়েও মোয়া হয়। তাকে বলে এইচার মোয়া। জলের জায়গায়, শালুক-পদ্মের

পৃথিবীতে এই খাদ্য সম্ভব। অন্যত্র কল্পনা করা কঠিন।

ব্যাঙ্ককে টুরিস্ট এলাকা খাউলান রোডের আশপাশের গলিতে পাইস হোটেলের ছড়াছড়ি। এক প্লেট গরম ভাত তার সঙ্গে কোনও কিছুর ঝোল। নাম শুনে বোঝার উপায় নেই কিসের ঝোল। সেখানে চিকেন ভেবে যে ঝোলটা কয়েকদিন খেয়েছি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন সেটা সাপ-ব্যাঙ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বিলেতে এক পাবে এক সন্ধ্যায় কালো বিয়ারের সঙ্গে আইরিশ সসেজ খেয়েছিলাম। এই সসেজও কালো ঝোলের মধ্যে চোবানো। সে যে কী ভয়ঙ্কর ঝাল। ব্রহ্মতালু পর্যন্ত আগুন লেগে গিয়েছিল। সাতদিন মুখে জ্বালা, পেটে চিনচিনানি।

তালিকা দীর্ঘ করব না। একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে শেষ করি।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় কয়েকদিন ছিলাম। অতিথিশালার ডাইনিং রুমের দেওয়ালে নোটিশ বোর্ডে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট করা আছে।

বোধহয় বছর দশ-পনেরো আগের মূল্য তালিকা। এর মধ্যে সেই দাম আর বাড়ানো হয়নি। অর্ডার দিলে বিরিয়ানি পাওয়া যাবে, আট টাকা প্লেট। চিকেন কাটলেট তিন টাকা। চা তিরিশ পয়সা, কফি চল্লিশ পয়সা, ভাত-মাছ সাড়ে চার টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম দিনই কৌতূহলভরে আমি ক্যান্টিনের ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এসব খাবার পাওয়া যাবে?'

ম্যানেজারবাবু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যাবে, কিন্তু খাওয়া যাবে না।'

আমি বললাম, 'তা হলে কী খাব?'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'আপনি চাইলে আমি বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে দেব।'

আমার কিন্তু জেদ হল, আমি বললাম, 'আমি সরকারি দামেই খাব। ওই যে দেখছি পরোটা পঁচিশ পয়সা করে ওই দুটো আর এক টাকার সবজি দেবেন।'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'খেতে পারবেন না। সরকারি গমের পরোটা। খাওয়া অসম্ভব।'

আমি বললাম, 'দিন না খেয়ে দেখি। রাত ন'টার সময় ঘরে পাঠিয়ে দেবেন।'

মফস্বলের ফাঁকা অতিথিশালা। ডাইনিং হলেও সাড়ে আটটা-ন'টার মধ্যে

খাওয়া-দাওয়া শেষ। রাত ন'টার একটু পরে আমার ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়ে ম্যানেজার চলে গেলেন।

খিদে লেগেছে! আমিও খেতে বসলাম। সবজি বলতে এক টুকরো আলু সেদ্ধ, তেল ছাড়া শুধু নুন আর লঙ্কা দিয়ে মাখা। সঙ্গে সন্দেহজনক চেহারার দুটো পরোটা।

একটা পরোটা ছিঁড়ে এক টুকরো টেস্ট করতে যাচ্ছিলাম। ছিঁড়তে পারলাম না। দাঁত দিয়ে কামড়ালাম, দন্তস্ফুট করতে পারলাম না। তখন আমার রোখ চেপে গেছে। টেনে টেনে দু'হাতের বুড়ো আঙুল টনটন করছে। পায়ের জুতো দিয়ে চেপে ধরে, দরজার কপাটের ভাঁজে চিপে ধরে, জলে ভিজিয়ে বহুরকম চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই সরকারি গমের পঁচিশ পয়সার অসূচীভেদ্য পরোটার গতি করতে পারলাম না।

শীতের রাতে দরদর করে ঘামছিলাম। আলুসেদ্ধটুকু মুখে দিয়ে দু গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়ার আগে জানলা দিয়ে পরোটা দুটো উঠোনে ছুঁড়ে দিলাম। উঠোনের একপাশে বেশ কয়েকটা নেড়ি কুকুর ছিল, তারা সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পরোটার উপরে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে প্রবল বাদ-বিতণ্ডা মারামারি চলল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, সেই পরোটা দুটো উঠোনের মধ্যখানে অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। আত্মকলহে ক্লান্ত কুকুরগুলি উঠোনের একপাশে শুয়ে আছে।

বউ কথা কও

এই রচনার নাম হওয়া উচিত 'বর কথা কও'। কিন্তু যেহেতু 'বউ কথা কও' একটি সর্বজনবিদিত সুকণ্ঠী পাখি আছে, তাই নামকরণে সেই বিখ্যাত বিহঙ্গকে উড়িয়ে আনলাম।

ভণিতা বেশি করে লাভ নেই।

মূল খবরটি রীতিমত ফলাও করে প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না।

সংবাদটি এসেছে খোদ চীন দেশ থেকে, সেখানকার রাজধানী পিকিং তথা

বেজিং থেকে প্রেরিত সংবাদ এটা। সমাজতান্ত্রিক দেশের থেকে আসা সুতরাং বিশ্বাস করতেই হবে। সংবাদটি প্রথম বেরিয়েছে, বেজিং ইভনিং নিউজ নামক দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকায়, সেখান থেকে উদ্ধৃত করেছে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া।

সংবাদটির বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্কে কারো মনে কোনো সন্দেহ না দেখা দেয় তাই এত কথা বলতে হল।

এবার মূল ঘটনায় যাই। দুঃখ ও আনন্দ মেশানো এমন চমকপ্রদ কাহিনী গল্প-উপন্যাসেও মিলবে না। বলিউডি সিনেমায় কিংবা চিৎপুরের যাত্রায় হয়তো এর কাছাকাছি গল্প পাওয়া যেতে পারে।

ঘটনাস্থল হল পূর্ব চীনের জেসিয়াং প্রদেশের একটি মফস্বল শহর। কাহিনীর নায়ক হলেন শ্রীযুক্ত লি নেংলৌ।

নেংলৌ সাহেবের ঘটনাটি অতি সংক্ষিপ্ত করে বলছি।



একদা, সে বহুকাল আগে নেংলৌ সাহেবের বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়ে কতদিন স্থায়ী হয়েছিল, কিংবা কি কারণে ভেঙে যায় সে সব কিছু জানা যাচ্ছে না, তবে খবর পাওয়া গেছে, আজ থেকে একুশ বছর আগে সেই উনিশশো ছিয়াত্তর সালে শ্রীযুক্ত লি নেংলৌর আগের বিয়ে ভেঙে যায়।

এই প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর শ্রীযুক্ত নেংলৌ শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েন।

বোধহয় বিবাহ-বিচ্ছেদের বেদনাতেই তিনি মূক হয়ে যান। সেই উনিশশো ছিয়াত্তর সালের পরে নেংলৌকে কেউ কখনো কথা বলতে দেখেনি। কথা বলেনওনি তিনি, সেই যাকে বলে শোকে পাথর হয়ে যাওয়া, নেংলৌ সাহেবের তাই হয়ে গিয়েছিল। তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি ঘটনা এক রোমাঞ্চকর বাঁক নিয়েছে। নেংলৌ পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই বিয়ের দিন বিয়ের আসরে এতদিনের শোকভার লাঘব করতে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নেংলৌ সাহেব প্রচুর মদ্যপান করেন।

মদ্যপান করতে করতে হঠাৎ নেংলৌ সাহেব উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে সুদীর্ঘ একুশ বছর পরে কথা বলতে শুরু করেন। ঝর ঝর করে কথা বলে যান তিনি, সঙ্গে অঝোরে কান্না।

নেংলৌ সাহেব আবার কখনো কথা বলতে পারবেন, তাঁর আত্মীয়স্বজন শুভানুধ্যায়ীরা এ কথা কখনো আশা করেনি। সাশ্রুলোচন, সবাক নেংলৌকে এতটা আবেগবিহ্বল আগে কখনো দেখা যায়নি।

এই ঘটনায় প্রতিবেদক প্রশ্ন করেছেন, কারণটা কি হতে পারে ঃ—

(১) অতিরিক্ত মদ্যপান।

(২) বিবাহবিচ্ছেদের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি।

(৩) পুনর্বিবাহের আনন্দ।

আমার মনে হয় এই তিনটি কারণই একত্র হয়েছিল এই ক্ষেত্রে।

তবে এক অর্থে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। বিবাহিত জীবনে অনেকে রুদ্ধবাক হয়ে যায় কিন্তু বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। আর ফিরে পেয়েই বা ফয়দা কি? বিয়ের পর কয়জন পুরুষমানুষই বা কথা বলার স্বাধীনতা পায়।

ফরাসী দেশে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে, বিয়ের পরে প্রথম দিকে স্বামী কথা বলবে স্ত্রী শুনবে। তারপর শুধু স্ত্রী কথা বলবে স্বামী শুনবে। তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কথা বলবে। কেউ কারো কথা শুনবে না। এবং অবশেষে স্বামী-স্ত্রী কেউই কিছু বলবে না, কেউই কিছু শুনবে না।

একটু অন্যরকম একটা গল্প একদা শুনেছিলাম।

স্বামী বেচারা বিছানায় শয্যাশায়ী। চোখ লাল, জিব শুকনো, নাক দিয়ে অনর্গল ধারায় জল পড়ছে, গায়ে বেশ জ্বর।

ডাক্তারবাবু এসেছেন। তিনি যথারীতি কয়েকটা নিয়মমাফিক প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক কোন জবাব না দিয়ে বোবার মত 'আ'-'আ' করলেন। ডাক্তারবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরকম কথা বলতে পারছেন না

কতদিন?' রোগী হাতের আঙুল তুলে দেখালেন আটদিন।

অতঃপর ডাক্তারবাবু রোগীর স্ত্রীকে বললেন, 'আপনার স্বামী যে কথা বলতে পারছেন না।'

শুনে ভদ্রমহিলা অবাক, 'সে কি? উনি তো একবারো আমাকে বলেননি যে উনি কথা বলতে পারছেন না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আজ আটদিন আপনার স্বামীর এই অবস্থা চলছে। ওঁর কাছে এইমাত্র জানলাম। আর আপনি জানতে পারেননি।

ভদ্রমহিলা কপালে করাঘাত ক'রে উচ্চস্বরে বললেন, 'হায় রে, আমার কপাল! কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু ডাক্তারবাবু আপনি নিজের চোখে দেখে নিজের কানে শুনে গেলেন, আজ আটদিন আমার স্বামী কথা বলতে পারছেন না। এই আটদিন এত কথা আমি তাঁকে বলেছি এই কথাটা উনি আমাকে একবারের জন্যও বলেননি।'

শেফালি

তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের বাংলা শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে কবিতার পাতার একটা অনিবার্য আকর্ষণ ছিল। প্রধান কবিরা সেইসব পুজা সংখ্যায় লিখতেন, আমরা তরুণ কবিরা হা পিত্যেশ করতাম তাঁদের পাশে আমাদের কবিতা দেখার জন্যে। এবং কখনও কখনও বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তো।

বেড়ালের কথা নয়। ফুলের কথা বলি।

অনেককাল, অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর আগের একটা শারদীয়া সংখ্যা, খুব সম্ভব কোন দৈনিক কিংবা তখনকার সাপ্তাহিকের পুজো সংখ্যা। কবির নাম খুব সম্ভব কিংবা নিশ্চয় দিনেশ দাস। সেই কবিতার প্রথম দুই পংক্তি, এতদিন পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি, যদি ভুল হয়, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

'শরৎ শেফালি পড়ে ঝরে,
তার সাথে কোনদিন ঝরিনি অঝোরে।'

এতকালের কথা, অবশ্যই আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারণা করতে পারে। এমনও হতে পারে উদ্ধৃত প্রথম পংক্তির দ্বিতীয় শব্দটি শেফালি ছিল না, ছিল শিশির।

কিন্তু এতকাল পরে এতে আর কিছু আসে যায় না। এতদিন বাদে, এই তিনযুগ পরে সেই শেফালি ফুলের অমল সৌরভ হঠাৎ ফিরে আসে।

রবীন্দ্রনাথ এক সাহসিকার কথা বলেছিলেন। আকুল আশ্বিনে, মেঘে ঢাকা দারুণ দুর্দিনে সেই সাহসিকা পায়ে নুপুর বেঁধে ঝঞ্ঝার মধ্যে পথে বেরিয়েছিলেন। কবি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে করবীর শেফালি মালিকা?'

মহাকবির ভুল প্রশ্ন। শেফালি বাঁধা থাকে না, শেফালি ঝরে যায়, প্রতি রাতে শয়নে-স্বপনে ঝরে যায়। বকুল ছাড়া আর কোন ফুল এমন অঝোরে ঝরে না।

কিন্তু বকুল সারাদিনই ঝরে। আর শেফালি ঝরে রাতের গভীরে, গোপনে, অগোচরে। ভোরের সূর্য ওঠাব আগে শরৎ বা হেমন্তরজনীর শিশিরবিন্দুর সঙ্গে।



তাছাড়া বকুল পোড়খাওয়া ফুল। ঝরে যাওয়ার পরেও সে টিকে থাকে। বাসি বকুলের গন্ধ আমাদের উন্মনা করে ফেলে।

শেফালি ক্ষীণায়ু। কোমলতনু। সংস্কৃতে শেফালি ফুলের সমাসজাত অর্থ হল যাতে ভ্রমর শয়ন করে। শেফ মানে হল শয়নকারী আর অলি হল ভ্রমর।

শেফালি ফুল হল অলির বিছানা। এমন ব্যঞ্জনা শুধু সংস্কৃত শব্দেই সম্ভব।

শুনেছি আমাদের উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে গুজরাটে, পুরনো সিন্ধু প্রদেশে শেফালি ফুলকে বলা হয় পারিজাত ফুল। পারিজাত কোন সাধারণ ফুল নয়। সমুদ্র মন্থনে সেই আদি যুগে দেব-দানবের মিলিত প্রয়াসে দেবতরু পারিজাত উঠে এসেছিল। প্যারি হল সমুদ্র, সেই সমুদ্র থেকে জাত, পারিজাত, পরিষ্কার পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস।

শেফালিকে আমরা পূর্ববঙ্গে, আমাদের গ্রামদেশে শেফালিই বলতাম। পশ্চিমবঙ্গে শিউলি বলে। আমি বলি না। শিউলি কেমন যেন সাদামাটা, ঘরগৃহস্থ। কেমন যেন বাড়িউলি, মুড়িউলির মত মনে হয়। আমার বাঙাল কানে একটু খটকা লাগে।

এবার শেফালি ফুলের বর্তমানে চলে আসি। নিউ ইয়র্কে পূর্বী নদীর তীরে পূর্বপাড়া, ইস্ট রিভারকে পূর্বী নদী বলেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী, সেই বিখ্যাত কবিতা 'ডুবে যাওয়া মানহাটানের পাশে। এক ধারা অশ্রুজল।' ঘরের কাছে শান্তিনিকেতনে রয়েছে পূর্বপল্লী। অনেক গ্রামে, মফস্বল শহরেও আছে পূর্বপাড়া অথবা পূবের পাড়া। ঠিক সেই রকম কলকাতায়ও সম্প্রতি একটা পূর্বপল্লী গজিয়ে উঠেছে, যার সরকারি নাম বিধাননগর, খবরের কাগজে লবণহ্রদ আর লোকমুখে সল্টলেক।

আমার বর্তমান বসবাস এইখানে। এই কথাটা এখানে এল এই কারণে যে এত শেফালি ফুলের গাছ আর কোথাও দেখিনি। পাডায় পাড়ায়। বাড়িতে বাড়িতে, পার্কের মধ্যে। রাস্তার ধারে শুধু শেফালি আর শেফালি, অগুনতি শেফালি।

বর্ষার শুরুতেই দুয়েকটি গাছে ফুল ফুটতে শুরু করেছিল, আর আজ এই শেষ হেমন্তেও অধিকাংশ গাছই ফুলবন্তী।

সারারাত টুপটুপ শেফালি ঝরে পড়ে। ভোরবেলায় ঘাসের ওপরে শিশিরভেজা শেফালি, হিমেল হাওয়ায় তার সৌরভ। হিন্দি ভাষায় শেফালিকে বলে হরশৃঙ্গার, দেবাদিদেবের পুষ্প সজ্জার জন্যে প্রকৃতি এই ফুল রচনা করেছিল। সেই সৌরভে মহাদেবের পুষ্পশৃঙ্গারের আভাস মেলে।

সকালবেলায় শেফালি ফুলের গন্ধে কেমন একটা উদাস-উদাস ভাব। কত কালের পুরনো স্মৃতি ফিরে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। আমার প্রতিবেশীরা প্রায় সবাই পৌঢ়, অবসরপ্রাপ্ত। ঝরে পড়া শেফালির ঘ্রাণে অবসরের দিন ভরে ওঠে। রোদ বাড়তে ঘাসের ওপর ফুলগুলোর ওপরে শিশির শুকিয়ে যায়,

ফুলগুলো নেতিয়ে পড়ে। মৃদু করুণ গন্ধ ভাসে কাছাকাছি বাতাসে।

ছোট বয়েসে এই ফুলগুলো কুড়িয়ে আমরা মালা গাঁথতাম। শেফালি ফুলের বোঁটা ছিঁড়ে হলুদ রঙে কাপড় রাঙাতাম। শেফালি ফুলের গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সে যে এই তো সেদিন।

এই লেখাটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। দোষ শেফালির। দোষ আমার নয়। দোষ প্রকৃতির, দোষ বাতাসের। গত বসন্তের দক্ষিণা হাওয়া বর্ষায় এসে পূরবৈয়া হয়েছিল এখন সে উত্তরে ঘুরছে। তবে এখনও মন স্থির করতে পারেনি। কখনো আমার বাঁ দিকের জানলার ওপাশে শেফালি গাছের পাতাগুলোয় আলতো করে বিলি কেটে দিচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই জোরে ঝাঁকি দিয়ে কয়েকটা ফুল মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই হাওয়া, ঝরা শেফালির হাওয়া, এই লেখাতেও এসে একটু লেগেছে।

সনাক্তকরণ

খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় 'সনাক্তকরণ' শব্দটির সঙ্গে আমাদের সাধাবণত দেখা হয় দুর্ঘটনার বিবরণে।

রংপুর বাস দুর্ঘটনায় ষোলজন নিহত। এর মধ্যে চারজনকে এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

কিম্বা বলরামগঞ্জের সিনেমা হলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যে আঠাশটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এতই বিকৃত হয়ে গেছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে তার মধ্যে অধিকাংশ মৃতদেহের সনাক্তকরণ প্রায় অসম্ভব।

সনাক্তকবণ আসলে একটি প্রাচীন আইনিপ্রথা। জীবিত মানুষকেও সনাক্তকরণ করতে হয়। রাহাজানির মামলায় একজন আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু এই লোকটাই যে রাহাজানিতে ছিল তার প্রমাণ কি?

উক্ত আসামীকে এবার আর কয়েকজন সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এবার যারা রাহাজানির সময় অকুস্থলে ছিল অর্থাৎ যারা সেই ঘটনাব প্রত্যক্ষ সাক্ষী, অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে এই আসামীকে চিহ্নিত করতে হবে। একে বলে আইডেনটিফিকেশন প্যারেড। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে

বিচারকেবা এই ধরনেব আসামী যাচাই করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

রম্যরচনায় দুর্ঘটনা, রাহাজানি, আইন আদালত এসব ভাল লাগে না। তবু আইডেনটিফিকেশন প্যারেড পর্যন্ত যখন এসে গেছি, এ বিষয়ে একটি অনবদ্য কার্টুনের কথা স্মরণ করছি।

সর্বকালের বাংলা কার্টুনের মুকুটহীন সম্রাট প্রমথ সমাদ্দার বিরচিত আলোচ্য কার্টুনটি প্রকাশিত হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, সেকালের জনপ্রিয় সরস সাপ্তাহিক 'সচিত্র ভাবতে'র প্রথম পৃষ্ঠায়।

জেলখানার সামনে আইডেনটিফিকেশন প্যারেড হচ্ছে, রাস্তা দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছেন, তাঁর খুবই মারকুটে হিংস্র চেহারা। তাঁকে পুলিশের জমাদার অনুরোধ করছে দু'মিনিটের জন্যে সনাক্তকরণ প্যারেডে দাঁড়িয়ে যেতে। সেই ভদ্রলোক বলছেন, 'দু'মিনিট? এব আগেরবার প্যারেডে দাঁড়িয়ে পাঁচ বছর জেল খেটে এসেছি।'



ভদ্রলোকের বক্তব্য পরিষ্কার, তাঁর চেহারাই এমন যে আইডেনটিফিকেশনের সময় সব সাক্ষীই তাঁকে আসামী বলে সনাক্ত ক রবে।

সনাক্তকরণ সোজা নয়।

রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের ধারে বাড়ি এক ভদ্রলোক একদিন শরীর খারাপ

বলে অফিস যাননি, সকালবেলা বাসায় বসে আছেন, ভদ্রলোকের নাম ননীবাবু।

ননীবাবুর বন্ধু মণিবাবু। তিনি অফিস যাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কিন্তু লেভেল ক্রসিংয়ে একটা দুর্ঘটনা চাক্ষুষ করে তাড়াতাড়ি ননীবাবুর বাড়িতে চলে এসেছেন, খুবই উত্তেজিত অবস্থা তাঁর।

অতঃপব ননীবাবু এবং মণিবাবুর কথোপকথন :

মণিবাবু: লেভেল ক্রসিংয়ের ওখানে একটা লোক রেলে কাটা পড়েছে।

ননীবাবু: হ্যাঁ, একটা হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে।

মণিবাবু: (একটু ইতস্তত করে) রেলে কাটা লোকটা ঠিক আপনার মত দেখতে।

ননীবাবু: বলেন কি?

মণিবাবু: আপনার মত বেঁটে, কালো, মাথায় টাক, সাদা-পাকা গোঁফ।

ননীবাবু: (আতঙ্কিত হয়ে) পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি?

মণিবাবু. ঠিক আপনারই মত ধুতি আর পাঞ্জাবি। তবে পায়ে দেখলাম কাবুলি চপ্পল।

ননীবাবু: (আশ্বস্ত হয়ে) এটা আগে বলবেন তো! ও লোকটা আমি নই। আমি কাবুলি চপ্পল পায়ে দিই না।

এর পরের ক্ষুদ্র কাহিনীটি এর চেয়েও মারাত্মক।

তাড়াতাড়ি লিফটে উঠতে গিয়ে রামলাল মিস্ত্রির কান লিফটের গেটে আটকিয়ে ছিঁড়ে নিচে পড়ে যায়। যন্ত্রণাকাতর রামলালের কাছে হাসপাতালেব বেড়ে সেই কান নিয়ে আসা হল।

'এটা আমার কান নয়। আমার কানে তো বিড়ি গোঁজা ছিল। লাল সুতো দিয়ে বাঁধা বিড়ি।' কানটা ভাল কবে দেখে সেটা বামলাল প্রত্যাখ্যান কবল।

এই হাস্যকর রচনায় রবীন্দ্রনাথকেও বা ছাড়ি কেন? সনাক্তকবণের ব্যাপার নিয়ে রবীন্দ্রনাথও কম মজা করেননি।

একদিন এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কবতে এসেছেন। ভদ্রলোক খুব সাজপোশাক করে এসেছিলেন। ধবধবে ধুতি, পাঞ্জাবি, কাঁধে মুগার চাদর, পায়ে চকচকে পেটেন্ট লেদারের জুতো।

ভদ্রলোক প্রণাম করে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন,'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

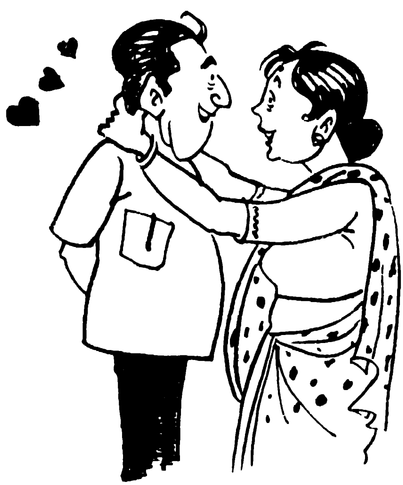
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। ভদ্রলোক তখন আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন,'আমি হলাম অঘোরবাবুর ছেলে।'

রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি অঘোরবাবুর ছেলে

এমন ঘোরবাবু হয়েছো, বুঝবো কি করে? সনাক্ত করা খুব কঠিন।'

শুভবিবাহ

আবার বিয়ের মবশুম এসে গেছে। লৌকিকতাব পবিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা আমন্ত্রণলিপিতে আবার ডাকবাক্স ভরে যাচ্ছে। হলুদ আর সিঁদুব ফোঁটা দেওয়া সচিত্র রঙিন লেফাফা হাতে সহাস্য প্রবীণ দম্পতি আবার সদর দরজায় কড়া নাড়ছেন।



দখিনা বাতাস ক্রমশ তপ্ত থেকে তপ্ততর হয়ে উঠছে। শহরতলির আমবাগানে শেষ বসন্তের কোকিল কুহুতানে মত্ত হয়ে উঠেছে।

এখন শুভবিবাহের কয়েকটা পুরনো গল্প বলা যেতে পারে।

দেখতে তেমন সুন্দরী নয় এমন একটি মেয়ে বিয়ের কিছুদিন পরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি যে আমাকে ভালবেসে বিয়ে করলে. তা তুমি কবে

টের পেলে যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছো?'

বর বেচারা বলল, 'যেদিন থেকে কেউ আমার কাছে তোমাকে কুৎসিত, বোঁচা, ধুমসি বললেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যেত, আমি ক্ষেপে গিয়ে তাদের তাড়া করে যেতাম, এখন মনে হচ্ছে সেই সময়েই আমি তোমার প্রেমে পড়ি।

অন্য এক সতীসাধ্বী তাঁর নববিবাহিত পতিরত্নকে যাচাই করছিলেন। প্রেমে গদগদ বরকে তিনি বললেন, 'তুমি যে তোমার প্রেমের এত বড়াই কর, তুমি যে বল যে তুমি আমাকে তোমার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসো, তুমি পারবে আমার জন্য মরতে?'

একটু থতমত খেয়ে, উচ্ছ্বাস ও আবেগ কতকটা দমন করে যুবকটি বললেন, 'তা বোধহয় পারবো না।'

ভ্রূ কুঞ্চন করে, ঠোঁট টিপে হেসে শ্রীমতী বললেন, 'তা হলে তুমি যে বল তোমাব প্রেম প্রাণের চেয়ে বড়?'

পতিদেবতা বললেন, 'যা বলি ঠিকই বলি। আসলে জানো তো আমার এ প্রেম হল অমব প্রেম।'

এরই পাশাপাশি আরও একটি অনুরূপ গল্প আছে। আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সে গল্প হয়ত নতুন নয়।

কিন্তু সংক্ষিপ্ত গল্পটি উৎকৃষ্ট মানের এবং উৎকৃষ্ট জাতের যে কোন দ্রব্য-সামগ্রীর মতই এ জাতীয় গল্পগাঁথাও 'অধিকন্তু ন দোষায়।'

প্রগাঢ় প্রেম বা ভালবাসার ভাবনার সঙ্গে বিচ্ছেদ তথা মৃত্যুর ভাবনার সম্পর্ক খুব নিকট। মাত্র একটি পাতলা পর্দার ব্যবধান।

প্রেম বিহ্বল এক নববর নববধূব কোলে মাথা বেখে বলল, 'বৌ আমি যদি মবে যাই?'

এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই, বৌ চুপ করে বসে রইল।

তখন বর বলল, 'আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?'

এবাব আর বৌ কি বলবে, সে বলল, 'হ্যাঁ কাঁদব, নিশ্চয়ই কাঁদব।'

ববাবাজি আবেগের বশে বোকার মত বলে বসল, 'বৌ তুমি একটু কেদে দেখাও তো, কেমন কাঁদবে?'

বৌ চন্দননগরের মেয়ে, প্রেম-ভালবাসা, দাম্পত্য ইত্যাদি বিষযে তার চিন্তা পরিষ্কার। সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বরকে বলল, 'তার আগে তুমি মবে দেখাও।'

অবশেষে একটা অভিজ্ঞতামূলক কাহিনী বলি।

সফল ব্যবসায়ী, আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক সেদিন আমাকে বললেন যে জানেন আমি আমার দোকানে বা অফিসে নতুন লোক নিতে গেলে আগে

দেখে নিই চাকুরিপ্রার্থী বিবাহিত না অবিবাহিত।

আমি বললাম, 'বিবাহিত-অবিবাহিত, কি রকম প্রার্থী আপনার পছন্দ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'অবশ্যই বিবাহিত পার্থী। আমার মেজাজ দেখেছেন তো, খুব চড়া মেজাজের লোক আমি, সব সময়ে কারও না কারও ওপর রাগারাগি করি। আমি দেখেছি বিবাহিত ব্যক্তিরা চেঁচামেচি, রাগারাগি নিঃশব্দে হজম করে কিন্তু অবিবাহিতরা পাল্টা মেজাজ দেখায়। আমি ঝামেলা এড়ানোর জন্য বিবাহিত ছাড়া কাউকে নিই না।'

আয় শীত, যায় শীত

কলকাতা শহরে শীত আসে আর চলে যায়। এটা সত্যিই আয় শীত, যায় শীতের দেশ। পুরো একটা শীতকাল এখানে পাওয়া যায় না। নভেম্বরের প্রথমে হয়ত আকাশ মেঘলা হয়ে, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির ছোঁয়ায় শহর একটু ঠাণ্ডা হয। তাবপর একটু গরম পড়ে আবার, আবার শীত, তারপর শীত একটু জেঁকে বসে। বড়দিন, নতুন বছর তারপর বড়জোর সরস্বতী পুজো পর্যন্ত একটু শীত শীত। অবশেষে শীত আসতে না আসতে চলে যায়। এ যেন সেই গত শতকের কুলীন বর, কন্যাব বাড়িতে যার অবস্থানের মেয়াদ অতি কম। কিংবা একালের তুলনা টেনে বলা চলে কলকাতার শীত যেন লোডশেডিংয়ের দিনের বিদ্যুৎ।

এসব অবশ্য পুরনো কথা।

শীতের ঠাণ্ডা কলকাতার

শীতহীনতাব, ঠাণ্ডাব অভাবের সব গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছে।

কলকাতায় এরকম শীতের প্রকোপ আর কখনও দেখা যায়নি। অন্তত গত পঞ্চাশ বছরে যে নয়, সেটা আমি আমার ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে হলফ করে বলতে পারি।

তাপের নিম্নাঙ্ক হয়ত কোনদিনই এত কম হয়নি যে খবরের কাগজে 'শতাব্দীর শীতলতম দিন' এইরকম হেডিংয়ে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায সংবাদ পবিবেশিত হতে পেরেছে।

তবে তিন দফায় বেশ কয়েকদিন ধরে নিম্ন তাপমাত্রা দশের আশেপাশে আনাগোনা করেছে। আর আমাদের সল্টলেক-দমদম অঞ্চলে তাপাংক পরপর দুদিন সাত ডিগ্রিতে নেমেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কলকাতা শহরের দীর্ঘ ইতিহাস, আবহাওয়া অফিসের রেকর্ড অনুযায়ী গত শতকের যে দিনটি চিহ্নিত সেদিনের সর্বনিম্ন তাপ ছিল ছয় ডিগ্রি। তবে কথিত আছে যে অষ্টাদশ শতকে একবার শীতে কলকাতায় বরফ পড়েছিল। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, যে শীতল আবহাওয়ায় বরফ পড়ে কলকাতায় সেটা সম্ভবপর নয়। ব্যাপারটার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল, সম্ভবত শেষ রাত্রে শিলাবৃষ্টি হয়েছিল এক গভীর শীতের রাতে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ইউরোপ থেকে নবাগত সাহেব-মেমরা উঠোনে রাস্তায় শিলা দেখে ওটাকেই তুষারপাত বলে ভ্রম করেছিলেন।

এবারের শীতের কামড় ছিল অন্যখানে।

অধিকাংশ দিনই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে তফাত ছিল যৎসামান্য। বড়জোর দু-তিন ডিগ্রি। ১১-১৩, ১২-১৫ এইরকম। সর্ব কম ঠাণ্ডা মারাত্মক কম না হলেও, ঠাণ্ডা হওয়া শরীর গরম হতে না হতে আবার ঠাণ্ডায় জমে যেতে হয়েছে।

এসব ঘটনা তো সবাই জানেন।

এবার শীতের দিনের মজার ঘটনা বলি। ঘটনাটি শিক্ষামূলক।

শীত বিষয়ে সবচেয়ে মজার এই ঘটনাটি তৈরি করেছিল একটি বালিকা। সেই মেয়েটিকে তার দিদিমণি ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গরমে বড় হয়, ঠাণ্ডায় ছোট হয়, এর একটা উদাহরণ দাও।'

পদার্থ বিজ্ঞানের 'তাপ' পরিচ্ছেদের একটি সুপরিচিত প্রশ্ন। আগে স্কুলের পরীক্ষা পাশ হওয়ার পর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে এসব জিনিস পড়ানো হত। আজকাল তো লেখাপড়ার মহোৎসব চলছে, স্কুলের নিচু ক্লাসেও এসব পড়ানো হচ্ছে।

সে আর কি করা যাবে?

আমাদের এই গল্প বালিকাটির বয়েস মাত্র এগারো বারো। দিদিমণির প্রশ্ন শুনে, অনেক চিন্তা করে, অনেক মাথা চুলকিয়ে বালিকাটি বলল, 'এতো সোজা। গরমে বড় হয়, ঠাণ্ডায় ছোট হয় দিন।'

দিদিমণি ভুরু কোঁচকালেন 'দিন?'

বালিকাটি বলল, 'হ্যাঁ, দিদিমণি। গরমের সময় দিন বড় হয়, আর শীতে ঠাণ্ডায় ছোট হয়ে যায়।'

এরপরে দিদিমণি কি বলেছিলেন, ঐ বালিকাকে অনেক প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি।

তবে শীত বিষয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি।



একবার মাঘ মাসের শেষে ধর্মতলায় একটা বড় দোকানে পাঞ্জাবি কিনতে গিয়েছিলাম। সে দোকানে তখন উইন্টার সেল চলছে।

দোকানে কৃতবিদ্যং সেলস্ম্যান আমাকে একটা কটস-উলের পাঞ্জাবি গছালেন। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছিলাম, 'সামনে গরমের দিন থাকছে, এখন কটস-উলের পাঞ্জাবি দিয়ে কি করব?

সেলস্ম্যান বললেন, 'গরমের দিনে কোন অসুবিধা হবে না। এটা অল-সিজন-পাঞ্জাবি।'

আমি অবাক 'অল সিজন। গরমের দিনে এই গরম পাঞ্জাবি গায়ে দেব কি করে?'

অতীব বুদ্ধিমানের হাসি হেসে সেলস্ম্যান বললেন, 'সব সময়ে গায়ে দেবেন কেন, গবমে আলমারিতে তুলে রাখবেন, শীতে গায়ে দেবেন, তাই তো অলসিজন।'

শীত নিয়ে যত কথাই বলি না কেন, আমাদের এই গরম দেশে শীত সবচেয়ে মনোরম ঋতু। শীতকালের নরম মধুর রোদে, শীতল বাতাসে যে কোন জায়গাই খুব ভাললাগে।

জানি শীতের দিন বড় ছোট, রাত খুব লম্বা। শীতে আম কিংবা ইলিশের মত সুখাদ্য দুর্লভ। তবু শীত কখনই ঠিক তত শীতল নয়, তার একটা উষ্ণ আবেদন আছে হৃদয়ের কাছে।

সবাই বলেন, শীতের সময় তাদের জায়গা খুব ভাল। আমাদের ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে থাকবেন শীতের সময় খাঁটি জয়নগরের মোয়া খাওয়াব। আমাদের পটলতোলা গ্রামে আসবেন খেজুরের রস খাওয়াব।

লোকে সপ্তাহান্তে দুদিনের জন্যে বেড়াতে যাবে। একবেলার জন্যে পিকনিক করতে যাবে। ফিরে এসে বলবে, 'চমৎকার'।

অনুমান করি মহামান্য যমরাজার সঙ্গে যদি জীবদ্দশায় দেখা হয়, তিনিও বলবেন, শীতের সময়ে একবার আমাদের নরকে ঘুরে যাবেন, দেখবেন কি চমৎকার।

একটি বাক্যের জন্ম

ইংরেজিতে ইডিয়ম আছে, ফ্রেজ আছে (Idiom, Phrase), কিন্তু বাংলায় এর সঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় অধুনা প্রচলিত ব্যাকরণ বইতে 'বিশিষ্টার্থক বাক্য' সম্ভবত ইডিয়ম বা ফ্রেজ বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়।

একটি সুপ্রাচীন, বিশিষ্ট ও বিশাল বাংলা অভিধানে এই জাতীয় বাক্য বা শব্দবন্ধগুলিকে 'প্রবাদ-প্রবচন' অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রবাদ-প্রবচন বলতে প্রচলিত, বহুকাল ব্যবহৃত বিশিষ্টার্থক বাক্যের কথা মনে পড়ে, যেমন 'যার ধন তার ধন নয়', 'নেপোয় মারে দই' কিংবা 'বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসী।'

আমি যে বাক্যটির কথা বলতে যাচ্ছি, সেটি খুবই সাম্প্রতিক রচিত, প্রবাদ-প্রবচনের আওতায় না পড়েও এটি যে একটি বিশিষ্টার্থক বাক্য সেটা স্বীকার করতেই হবে।

বাক্যটির বিষয়ে একটু পরেই আসছি। তার পূর্বে কিঞ্চিৎ ভূমিকা প্রয়োজন।

আজ কিছুদিন হল আমি খেয়াল করছি যে বহু বিশিষ্টার্থক বাক্য বা শব্দবন্ধই রচিত হয়েছে মারামারি-কাটাকাটি নিয়ে। জুতিয়ে লম্বা করা, কচুকাটা করা,

বেতিয়ে সিধে করা, পিটিয়ে তক্তা করা থেকে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেওয়া পর্যন্ত প্রচুর উদাহরণ এই মুহূর্তে পেশ করতে পারি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায় কিম্বা ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার এরকম স্মরণীয় প্রবাদ বাক্যের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রবচনের চেহারা-চরিত্রও বদলিয়ে যায়।

আজকাল আর শুনি না, আমাদের যুবক বয়সে বহুবার শুনতে হয়েছে। 'মেরে মুখের জিওগ্রাফি পালটিয়ে দেবো।' মানে এমন মার মারবে যে মুখ মণ্ডল তছনছ হয়ে যাবে। চোখ ফুলে যাবে, নাক গর্তে ঢুকে যাবে, দাঁত ভেঙে যাবে, ঠোঁট ফেটে যাবে, কান চিপটে যাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রহারের ফলে মুখের মানচিত্র বদলিয়ে যাবে।



বছর কয়েক আগে একবার পাটনায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এই জিওগ্রাফি পালটানোর অনুরূপ একটি বাক্য শুনেছিলাম।

বাক্যটি হল, 'তোমার দৈর্ঘ্য ছয় ইঞ্চি কমিয়ে দেব।' এই বাক্যে পাটনাই কায়দায় সোজা খুনের ভয় দেখান হয়েছে। কেটে ফেলবে, মুণ্ডু বাদ গেলে কবন্ধ ধড়ের উচ্চতা ছয় ইঞ্চি কমে যাবে।

শুধু ভয় দেখানো নয়, এক পুলিশ সাহেব আমাকে বলেছিলেন, মাফিয়া

সর্দারেরা নাকি চেলা-চামুণ্ডাদের নির্দেশও দেন।

কোনও সরকারি অফিসার খুব পিছে লেগেছে, কোনও লোক কথা মত কাজ করছে না, কোনও রাজনৈতিক নেতার খুব বাড় বেড়েছে, 'দে লোকটার উচ্চতা ছয় ইঞ্চি কমিয়ে।'

এই জাতীয় একটি প্রবচন সম্প্রতি আমাদের এই শহরেও প্রচলিত হয়েছে। শোনা কথা নয়, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

এই তো গত সপ্তাহের কথা। কলেজ স্ট্রিট বই পাড়ায় একটু কাজ ছিল। কাজ সেরে শিয়ালদহের দিকে ফিরছি, পুরনো মির্জাপুর স্ট্রিট আর মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে দেখলাম দুই দল ছেলের মধ্যে চরম বচসা চলছে। পাশ কাটিয়ে চলে আসছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম একটি মাস্তানগোছের ছেলে প্রতিপক্ষকে বলছে, 'এখনও সাবধান, না হলে মেরে আমহার্স্ট স্ট্রিটের যিশুখ্রীষ্ট বানিয়ে দেব।'

প্রথমে খেয়াল করিনি, তারপর মনে পড়ল, এই পাড়াতেই আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক বাড়িতে যিশুর মূর্তি দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বক্ত চুইয়ে চুইযে পড়ছে। দলে দলে লোক ভিড় করে যাচ্ছে সেই দৃশ্য দেখতে।

বুঝতে পারলাম 'আমহার্স্ট স্ট্রিটের যিশু বানিয়ে দেব' মানে একেবারে রক্তারক্তি করে দেব।

বুঝতে পারলাম, একটি প্রবচন, নতুন একটি বাক্যের জন্ম হয়েছে।

প্রস্তাবনা

ভালবাসার বিয়েতে, মানে বাংলায় যাকে সাধারণত লাভ-ম্যারেজ বলে, বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার একটা প্রথা আছে।

কিছুদিন মেলামেশা চলার পর, ঘনিষ্ঠতা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেলে সাধারণত প্রেমিক প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবিত বিয়ে যে সবসময় হয় তা কিন্তু নয়, মেয়েরা কখনও কখনও শেষ পর্যায়ে এসে পিছিয়ে যায। আবার প্রেমিকার দিক থেকে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও বহু ক্ষেত্রে পুরুষটি বিয়ে করার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। এ অবশ্য খুবই সাধারণ ব্যাপার। বহু জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়।

আমরা যারা আক্কেল দাঁত উঠবার আগেই কোন কিছু বুঝবার আগেই বিয়ে করে বসেছিলাম, আমাদের পক্ষে কিন্তু বোঝা কঠিন বিয়ে করতে সাহস লাগে কেন।

এ বিষয়ে অধিক আলোচনায় গিয়ে এ বয়েসে আর সাহস দেখানোর ইচ্ছে নেই। তার চেয়ে এবার সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবের উপাখ্যানে আসি।

এক অনূঢ়া মধ্যবয়সিনী মহিলাকে তাঁর ভাইঝি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, সোনাপিসি তোমাকে কেউ কোনদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল?'

সোনাপিসি বললেন, অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, 'তা একবার দিয়েছিল।'

ভাইঝি বলল, 'তা তুমি বিয়ে করতে রাজি হলে না কেন?'



সোনাপিসি বললেন, 'রাজি হব কি করে? রং নম্বর ছিল যে, ভদ্রলোক ফোন করতে গিয়ে নম্বর ঘুলিয়ে ফেলেছিলেন।'

এরই পাশাপাশি একটা মাঝারি কেতার পুরনো গল্প আছে।

যৌবন মদমত্তা এক অবিবাহিতা যুবতী একদা মধ্যরাতে একটি মদমত্ত পুরুষকণ্ঠের ফোন পেলেন, 'বাসবদত্তা, তুমি শেষবারের মত বলে দাও তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না?

বুদ্ধিমতী বাসবদত্তা বললেন, 'এ বিষয়ে সন্দেহের কি আছে? আমি তোমাকে

ছাড়া আর কাকে বিয়ে করব?'

ভদ্রলোক গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমাকে বাঁচালে।'

বিপদমুক্তা বাসবদত্তা ফোন নামিয়ে রাখার আগে, একটা ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা তুমি কে? তোমার নামটা বললে না তো?'

জানি, অতঃপর নাম বলার অবকাশ আর থাকে না। তবে কি এর বিপরীত প্রান্তের একটা আখ্যান আছে, প্রথমোক্ত পিসি-ভাইঝির ডায়ালগে গল্পটা বলি।

একদিন সকালবেলায় সোনাপিসি চায়ের টেবিলে ভাইঝিকে চেপে ধরলেন, 'কাল সন্ধ্যাবেলা মৌলিনাথের সঙ্গে অত চেঁচামেচি করলি কেন?'

ভাইঝি বলে, 'চেঁচামেচি করব না? খালি বলে, আমাকে বিয়ে করবে কি না, আমাকে বিয়ে করবে কি না?'

সোনাপিসি বললেন, 'এ তো খুব সুসংবাদ। তুই রাজি হচ্ছিস না কেন?'

ভাইঝি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কি বোবা নাকি? রাজি তো হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেকদিনই মৌলিনাথ জিজ্ঞাসা করছে আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি কি না। প্রত্যেকদিনই আমি রাজি হচ্ছি। এ আর কাঁহাতক চলে!'

প্রস্তাবনার শেষ গল্পটি একটু জটিল।

শ্যামলচন্দ্র শ্যামাকে বলল, 'দ্যাখো আমি যে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি এ কথা কাউকে যেন বলবে না, গোপন রাখবে।'

শ্যামা বলল, 'শুধু কমলকে বলব।'

শ্যামল বলল, 'কমলকে কেন?'

শ্যামা বলল, 'কমল আমাকে বলেছিল, এমন কোন বোকা পুরুষ মানুষ পাওয়া যাবে না যে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে।'

ভালোবাসার সন্ধানে

আচ্ছা, মধুমিতা তোমার তো বয়েস একুশ-বাইশ মতান্তরে সাতাশ আটাশ হল। তুমি বিয়ে করোনি কেন?

বর কোথায়?

কেন? মা-বাপ কখনো কোন সম্বন্ধ করেননি?

সম্বন্ধের বিয়ে আমার পছন্দ নয়। সেই সেজেগুজে যেতে হবে। আগুনের

পবশমণি গাইতে হবে। মোচার ঘণ্টে আদা দিতে হয় কি না, আলাস্কার রাজধানী কোথায়—এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

খবরের কাগজে তো নানা রকম বিজ্ঞাপন বেরোয়, তার থেকে নিজেই বাছতে পারো।

পাত্র-পাত্রীর কলমের সবই তো আসলে সেই শিবরাম চক্রবর্তীর বিজ্ঞাপন।

শিবরাম চক্রবর্তীর বিজ্ঞাপনটা আবার কি? তিনি তো ব্যাচেলর ছিলেন। তিনিও কি নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি।

তা দেবেন কেন? বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি।

তা হলে বিজ্ঞাপনটা কিসের?



সপ্তাহে সপ্তাহে খবরের কাগজে মজার মজার কলাম লিখতেন শিবরাম। তা সেই কলামে শিবরাম একবার একটা বিয়ের বিজ্ঞাপনের খসড়া দিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল, 'পাত্রীর নিজস্ব বাড়ি থাকা প্রয়োজন। বাড়ির ফটোসহ আবেদন করুন।'

বুঝতে পেরেছি, তুমি কি বলতে চাও। তা হলে বিয়ে করতে গেলে তোমাকে প্রেমের পথে যেতে হবে।

সে তো চেষ্টা করে যাচ্ছি, কোন সুবিধে হচ্ছে না।

হেঁজি-পেঁজি, রানী-বানী, সবিতা-কবিতা সকলের হিল্লে হয়ে যাচ্ছে। আর তোমার সুবিধে হচ্ছে না।

চেষ্টায় তো ত্রুটি করছি না।

তা কি রকম চেষ্টা করছো, শুনি।

শেষেরটাই বলছি।

বলো। মন দিয়ে শুনছি।

আমাদের পাড়ার মোড়ে একটা নতুন বইয়ের দোকান হয়েছে না। সেই দোকানের মালিকের ছেলে দোকানে বসে। দেখতে চমৎকার, স্মার্ট, লেখাপড়া করা ছেলে।

তুমি তাকে গিয়ে সরাসরি প্রেম নিবেদন করলে?

আমি কি বোকা নাকি? আমি করলাম কি ওর ওখান থেকে 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনলাম। ছেলেটি কিন্তু নির্বিকার। একবারও আমার দিকে তাকাল না। নিঃশব্দে বইটা প্যাকেট করে দিল।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলছেন। শুনুন না। দু'দিন পর ওই দোকান থেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেছে কিনলাম 'যৌবনের গোপন তথ্য'। ছেলেটির কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'দিন গেল। তারপর কিনলাম 'সুখী ও সার্থক বিবাহিত জীবন'। ছেলেটির দিকে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলাম না।

তারপর?

তারপর, আর কি? ওই দোকানে আর কখনও যাব না। ওই ছেলেটি আমাকে অপমান করেছে। কাল ওই দোকানে বই ঘাঁটছি এমন সময় ছেলেটি একটি বই এগিয়ে দিয়ে বলল, এবার আপনার বোধহয় এই বইটির প্রয়োজন পড়বে।

কি বইটি?

বইটির নাম হল, 'সহজ শিশু পালন পদ্ধতি।'

ধার

আমার জানাশোনার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে জীবনে কখনও ধার করেনি।

আবার ধার করেছে তারপরে সব ধার শোধ করেছে, এমন লোকও খুঁজে পাওয়া কঠিন। হয়তো দেনদার ধারের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। অবশ্য এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

আমার নিজের কথা বলতে পারি। দুটো সুপ্রাচীন অশোধিত ধারের কথা আমি আজও বিস্মৃত হইনি।

উনিশ শো আটান্ন সাল। ঠিক চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সদ্য এম এ পাশ করে কলকাতার কাছে মফস্বলে একটা শিক্ষকতা পেয়েছি। খুবই অর্থাভাব চলছে, সত্যি কথা বলতে কি রাহা খরচের অভাবে কাজে যোগদান করতে যেতে পারছি না।

করুণাদা উদ্ধার করলেন, করুণাশঙ্কর রায় এখনকার হাইকোর্টে জাঁদরেল ব্যারিস্টার, তখনও তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করে আসেননি, আমারই মত আধা বেকার, তবে বাড়ির অবস্থা ভাল এবং আমাকে পছন্দ কিংবা স্নেহ করতেন।

করুণাদা আমাকে একটা আস্ত দশ টাকার নোট ধার দিলেন। সে দশ টাকার নোটের মর্যাদা ছিল এখনকার একশো টাকার নোটের চেয়েও বেশি। আকার এবং আয়তনের আধুনিক একশো টাকার নোটের চেয়ে অনেক বড়।

আর ক্রয় ক্ষমতা? কাটা পোনা চার সের (এখন চার কেজি), খাসির মাংস চার কেজি, আমাদের প্রিয় ভাজা তামাকের গন্ধ ভরা চারমিনার সিগারেট একশো প্যাকেট—সেই সনাতন দশ টাকায় কেনা যেত।

সেই মহার্ঘ দশ টাকা করুণাদাকে অদ্যাবধি আমার পরিশোধ করা হয়নি।

গত চার দশকে তাঁর সঙ্গে আমার ইতিউতি দেখা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আইনঘটিত অধিকাংশ মামলায় তিনি লেখককুলেব কৌসুলি। একাধিকবার তাঁব চেম্বারেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। কিন্তু সেই দশ টাকা শোধ দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

এ হল দেনদার তারাপদ রায়ের কথা। পাওনাদার তারাপদ রায়েরও একটা গল্প আছে।



ধার দিতে আমার ভাল লাগে না। এক সুদের ব্যবসা যারা করে তা ছাড়া আর কারোরই নিশ্চয় ভাল লাগে না। কিন্তু সমাজে বসবাস করতে গেলে, সংসারে থাকতে গেলে মাঝে-মধ্যে ধার দিতেই হয়।

এবং এ ব্যাপারটা এক তরফা নয়, ধার দেওয়ার যেমন দরকার পড়ে, তেমনিই আমাদের জীবনে ধার নেওয়ারও কখনও কখনও দরকার পড়ে।

কে যে ধার চাইবে বা চাইতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। কোন কোন লোকের রীতিমত ধারকুটে চেহারা, দেখলেই মনে হয়, এই বুঝি বলবে, 'ভাই তোমার কাছে পঞ্চাশটা টাকা হবে।'

এই লোকটা হয়তো সত্যিই কোনদিন ধার চায় না। আবার এমন সুজন আছে, যে বিনা বাক্যব্যয়ে, যেন আমারই উপকার করছে এইভাবে একশো

টাকা নিয়ে চলে যায়।

তা যাক। কিন্তু বহুক্ষেত্রে সে আবার ধার শোধ দিতে ভুলেও যায়। এক ঘোরতর অর্থকষ্টের দিনে তাকে একবার টাকার তাগাদা দিয়েছিলাম। সে কিছুতেই মনে করতে পারল না কবে আমার কাছ থেকে একশো টাকা ঋণ নিয়েছিল।

আমি অপমানিত বোধ করলাম এবং সেইজন্যেই আরও চেপে ধরলাম। অগত্যা সে বলল, 'এত কথা কাটাকাটির কিছু নেই, তুমি যখন নেহাৎই বলছ ব্যাপারটা ফয়সালা করে দিচ্ছি।'

ফয়সালা আর কিছুই নয়, পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে সে বলল, 'এই নাও। এই পঞ্চাশ টাকা ধর। আমার হিসেব মত আমারও কিছুটা ক্ষতি হল, তোমার হিসেব মত তোমারও কিছুটা ক্ষতি হল।'

বিশ্বকাপ

আকাশ-পাতাল, মাথা মুণ্ডু কত কি বিষয় নিয়ে লিখি। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু লিখিনি। অথচ বিশ্বকাপ নিয়ে কি উত্তেজনা চলছে, কি রমরমা। যেন ফুটবলই সব, যেন ওই চর্মগোলকের মধ্যে বিশ্বসংসারের সমস্ত আবেগ নিহিত রয়েছে।

কলকাতার কথাই ধরা যাক। যে ছেলে বা মেয়ে কোনদিন রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করেনি, যে বৃদ্ধ সন্ধে না হতেই শয্যায় আশ্রয় নেয়, সবাই রাতে না ঘুমিয়ে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত খেলা দেখছে, উৎকণ্ঠায়-উত্তেজনায় অস্থির।

খবরের কাগজগুলো গত ছয় সপ্তাহ ধরে যে পরিমাণ কাগজ-কালি এবং অর্থব্যয় করেছে বিশ্বকাপ নিয়ে, তিনটে সাধারণ নির্বাচনেও তা হয় না।

আমাদের নিজের দেশ, শুধু আমাদের দেশ কেন হিমালয়ের এপার-ওপারের কোনও দেশ বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেনি। পূর্ব গোলার্ধের এক প্রান্তে আরব, ইরান এবং অন্য প্রান্তে কোরিয়া, জাপান মূল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু কোনও সুবিধে করতে পারেনি।

যে দেশ জিতছে বলে আমরা আনন্দে আত্মহারা, যে দেশ হারছে দেখে আমরা দেয়ালে কপাল ঠুকছি, সেই দেশগুলি কোথায়, সেগুলো কেমন দেশ,

তাদের জেতা কিংবা হারায় আমাদের কি - এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আমাদের কোনও অবকাশ নেই। তেমন জ্ঞানও নেই।

তবু বলি, এ সব কারণের জন্যেই অদ্যাবধি আমি বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু লিখিনি তা নয়।

আমার কারণটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং রীতিমত অপমানজনক।

বাংলাদেশের একটি কাগজে কারণটি সম্প্রতি আমি জানিয়েছি। যতদূর মনে পড়ে বছর আটেক আগে নব্বুইয়ের বিশ্বকাপের সময় কলকাতাতেও কোনও এক কাগজে বিশ্বকাপ তথা ফুটবল নিয়ে কোনও কিছু লেখার অক্ষমতা আমি জ্ঞাপন করেছিলাম। সেই সঙ্গে কারণটা ব্যক্ত করেছিলাম।

পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই আমার কাছে দাবি করতে পারেন সেই কারণটা কি এবারও জানানোর জন্যে।

* * * * * * * * *

পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমার বয়েস এগারো-বারো, স্কুলে ক্লাশ এইটে পড়ি। থাকি মাতৃভূমি পূর্ববঙ্গের এক জঙ্গি মহকুমা শহরের আদালত পাড়ায়।

ফুটবল ম্যাচ পাড়ায়-পাড়ায়। আমাদের ম্যাচ পড়েছে প্রতিবেশী ফৌজদারি পাড়ার সঙ্গে। দুই পাড়ার মধ্যে একটা খাল। খালের ওপারে ফৌজদারি পাড়া, সেখানেই খালধারে শিবনাথ স্কুলের মাঠে দু'দলের খেলা, আমি গোলে।

খেলতে নেমে আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে ফেললাম এ এক অসম্ভব, অসম প্রতিযোগিতা। যেখানে আমাদের দলের প্লেয়ারদের বয়েস দশ-বারো, বিপক্ষ খেলোয়াড়দের গড় বয়েস অন্তত পনেরো, দু-চারজন সতেরো-আঠারো আছে। তদুপরি তারা শক্তিশালী এবং মারকুটে।

ফলে যা হবার ঠিক তাই হল।

আমরা ক্রমাগত গোল খেতে লাগলাম। প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে দশ গোল।

ইতিমধ্যে আমার সহখেলোয়াড়েরা সম্মানজনক পশ্চাদপসারণ শুরু করেছে। খেলার মাঠের পাশে বড় রাস্তা, রাস্তার ওপারে খাল, গ্রীষ্মদিনের শুকনো খাল পেরোলেই আমাদের পাড়া, নিরাপদ আশ্রয়।

আমাদের প্লেয়াররা একজন-একজন করে টুকটুক করে খেলা ছেড়ে পালিয়ে গেল। সমর্থকেরাও কেটে পড়ল।

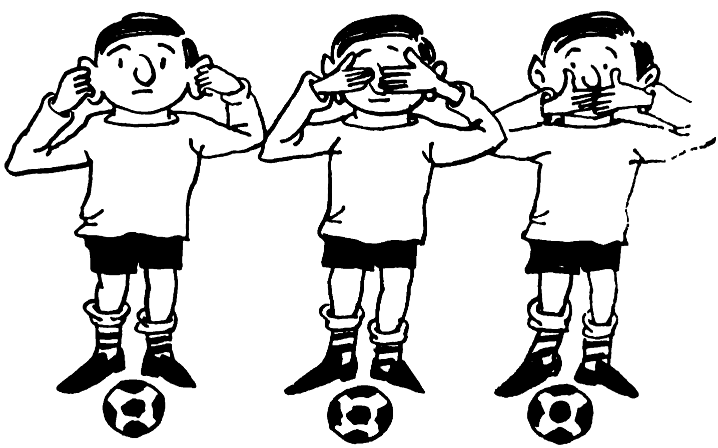
প্রথম দিকে ফৌজদারি পাড়ার লোকেরা ও খেলোয়াড়েরা কিছু অনুমান করতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তারা 'ধর-ধর' করে দৌড়ে গেল, আমি

ছাড়া সব প্লেয়ারই তখন নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছেছে।

শুধু আমি একা গোলে বন্দি। ফৌজদারি পাড়ার সবাই এসে আমাকে ধরল, 'তোমাকে পালাতে দিচ্ছি না। গোল শোধ দিয়ে যেতে হবে।'

আমি বললাম, 'এগারোজন মিলে দশ গোল খেয়েছি। দশজন পালিয়েছে। আমি একা গোল শোধ দেব?'

খুবই সমীচিন প্রশ্ন। ওরা অনেকক্ষণ ধরে খুব মাথা ঘামালো। তারপরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে ছাড়তে পারি। কিন্তু তার আগে দশ হাত নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, 'জীবনে আব কখনও ফুটবল খেলব না, ফুটবল নিয়ে কোনও আলোচনা করব না। কখনও ফুটবল খেলা দেখব না।'



পঞ্চাশ বছব হয়ে গেছে। আজও আমি সেই প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইনি। ফুটবল খেলি না, ফুটবল খেলা দেখি না, ফুটবল খেলা নিয়ে আলোচনা করি না।

বিশ্বকাপের পরে

আমাদের কাজের মেয়ে সন্ধ্যার ধারণা হয়েছিল, এই যে দিনের পর দিন রাত জেগে আমরা ফুটবল খেলাটা দেখছি, এই খেলাটার নাম 'বিশ্‌শো কাপ'।

বিশ্‌ শো কাপ, মানে দু হাজার কাপ। দু'হাজার কাপ চা।

দূরদর্শনে আমরা বাড়ির সবাই মশগুল হয়ে খেলা দেখেছি। সন্ধ্যা গামলা-গামলা চা তৈরি করেছে। আমাদের সঙ্গে সমানে রাত জেগেছে, খেলাও দেখেছে। সন্ধ্যা কি বুঝেছিল কে জানে। শেষ দিনে ব্রাজিল হেরে যাওয়ার পর তার কি হাপুস কান্না।

সন্ধ্যা প্রথমদিকে হিসেব রাখত কত কাপ চা করল। প্রথম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত দেড়শো-দুশো কাপ চায়ের হিসেব মনে মনে রাখার চেষ্টা করেছিল, তারপর আর পারেনি।

ব্রাজিল পতনের রাতে খেলা শেষ হওয়ার পরে শেষ রাউন্ড চা আর সে করেনি। চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল, 'আর চা হবে না। বিশ্‌ শো কাপ হয়ে গেছে।'

ব্রাজিল পতন! বাস্তিল পতনের সঙ্গে কথাটার মিল আছে না! দু'দিন পরেই ফরাসি বিপ্লব দিবস। ব্রাজিলকে হারিয়ে সেও এক-আধ গোলে নয়, তিন গোলে ফ্রান্স আবার বিপ্লব ঘটালো।

সেদিন শেষরাতে আমি ধরে নিয়েছিলাম নিশ্চয়ই কাল সকালে খবরের কাগজে হেড লাইন দেখতে পাব, 'ব্রাজিল পতন।'

না। আমার আশা পূরণ হয়নি। সবাই ফরাসি বিপ্লবের কথা বলেছেন, কিন্তু ব্রাজিল আর বাস্তিল নবীকরণে ব্রাজিলপ্রেমী কলকাতার সাংবাদিক সমাজ মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না।

সে যা হোক ইতিমধ্যে শহর আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ঘুমের অভাবে ফোলা চোখ, ভাঙা ভাঙা গলা সেই সব মানুষদের আর রাস্তাঘাটে, ট্রামে-বাসে অফিস কাছারিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাত জেগে খেলা দেখে সাবা সকাল ঘুমঘোরে বিফল কৃষক এবং ধীবরেরা আবার দৈনন্দিন কাজে ফিবে এসেছেন। মাঠ থেকে বেগুন-লঙ্কা আবার তোলা হচ্ছে, দাম ক্রমশ পড়তির মুখে। ধীববেরা আবার নদীতে জাল ফেলছেন। বাজার ইলিশে ছেয়ে গেছে।

এদিকে পরচুলার দাম, ভাড়া খুব বেড়ে গেছে। ব্রাজিলগত প্রাণ যে সব ক্রীড়াপ্রেমী মাথা ন্যাড়া করেছিলেন, শুধু ন্যাড়া করেই ক্ষান্ত হননি, মুণ্ডিত মস্তকে আলকাতরা কিংবা আবও শক্ত বং দিয়ে নাইন (৯) লিখেছিলেন। তাঁরা এখন মাথা লুকোতে ব্যস্ত।

আবার কবে চুল গজাবে তাব অপেক্ষায় না থেকে আপাতত পরচুলাই সম্বল।

সব বড় ব্যাপারের সময়েই এ রকম হয়, হযে থাকে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ চোরদের যা কষ্ট গেল, তা আর কহতব্য নয়।

গত শনিবার সন্ধ্যেবেলা যথারীতি হাঁটতে বেরিয়েছি। বাইপাসের পাশে স্টেডিয়াম। হাতে সময় থাকলে স্টেডিয়ামটা একপাক ঘুরে আসি।



নারকেলডাঙা মোড়ের কাছে দেখি স্টেডিয়ামেব দেওয়ালে বসে রয়েছে কয়েকজন ছায়া ছায়া মানুষ। একটু সামনে যেতে মুখগুলো স্পষ্ট হল। দুয়েকটি আমার চেনা। অদূব অতীতে আমি জেলের ভিজিটিং কমিটির সদস্য ছিলাম।

একাধিক দাগি চোরের মুখ আমি চিনতে পারলাম। তারা আমাকে দেখে দেওয়াল থেকে লাফিয়ে নামল। সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল, 'স্যার, ধনে প্রাণে শেষ হয়ে গেলাম।'

আমি বললাম, 'কেন?'

সবচেয়ে সেয়ানা চোর বলল, 'স্যাব বিশ্বকাপ। সবাই বাত জেগে খেলা দেখছে চুরি করি কখন?'

আমি বললাম, 'কালকেই তো খেলা শেষ।'

আমার কথা শুনতে পেয়ে দেওয়ালের ওপরে যে বিশ-পঁচিশ জন বসে ছিল তারা লাফ দিয়ে নেমে এসে আভূমি প্রণত হল। আবার সেয়ানা চোরটি বলল, 'স্যার আপনার বাড়ির নম্বরটা দেবেন।'

আমি বললাম, 'প্রথম দিনই আমার বাড়িতে চুরি করবে?'

সবাই, সমস্বরে বলল, 'আপনার বাড়িতে আমরা কেউ কোনওদিন চুরি করব না।'

চিত্র বিচিত্রা

কবি দম্পতি চিত্রা এবং দীপক লাহিড়িকে কোনও এক উপলক্ষে আমাব লেখা একটা বই উপহার দিয়েছি। সেখানে লিখে দিয়েছিলাম, 'সচিত্র দীপককে।'

এখন তো নারীবাদীর যুগ। চিত্রা বলল, 'সচিত্র নয়, সচিত্রা লিখুন।'

আমার ব্যাকবণ জ্ঞান সীমিত, আমি বললাম, 'সচিত্রা দীপক' ব্যাকরণসম্মত হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবুও 'সচিত্রা দীপক' লিখে দিলাম।'

সে যা হোক, আজকের এই চিত্র বিচিত্রা কবিদের নিয়ে নয়, প্রকৃত চিত্র তারকাদের নিয়েও নয়। আসল সিনেমা নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

এই সূত্রে প্রথমে স্মরণ করি স্বর্গীয় দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল বা দী-কু-সাকে। একালের নবীন পাঠক-পাঠিকারা সম্ভবত দীপ্তেন সান্যালের নাম জানেন না। জানার কথাও নয়।

দীপ্তেন সান্যাল ছিলেন 'অচলপত্র' পত্রিকার সম্পাদক, অচলপত্রে চপল

এবং তরল সাংবাদিকতার যে নজির আছে, বাংলাভাষায় সেটা বিরল, আমাদের প্রথম যৌবনের সব রসিকতা, হাসি-তামাশার উৎস ছিল এই অচলপত্র।

দীপ্তেন সান্যাল নিজে সিনেমা জগতের সঙ্গেও কিছুটা জড়িত ছিলেন। তাঁর বাবা সুধীরেন্দ্র সান্যাল ছিলেন তখনকার টালিগঞ্জীয় সিনেমার ডাকসাইটে প্রচার অধিকর্তা।

সে যা হোক, এই দীপ্তেনবাবু একদা তাঁর অচলপত্রে লিখেছিলেন যে এখনকার শিশুরা মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে আর 'মা, মা' বলে কাঁদে না, তারা কাঁদে 'সিনেমা, সিনেমা' বলে।

অবশ্য সেটা ছিল পঞ্চাশ-ষাটের যুগ। চলচ্চিত্রের রমরমা সময়, তখনও বিনোদনের পৃথিবীতে দূরদর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।



এখন তো সিনেমা হলে লোক হওয়াই কঠিন, বিশেষ করে বাংলা ছবি যদি হয়।

দেশে-বিদেশে এখন সর্বত্র চলচ্চিত্র উৎসব। আন্তর্জাতিক সিনেমা মেলা। সেখান থেকে কত পরিচালক কতরকম পুরস্কার নিয়ে আসছেন, কিন্তু বাঙালি দর্শক তাঁদের পাত্তা দিচ্ছেন না। তাঁদের পরিচালিত বই হলে তিনদিনের বেশি চলছে না।

এরকম একটা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীব সময় হলের ম্যানেজার হলের সামনে ফেস্টুন টাঙিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল.

'প্রবেশমূল্য লাগিবে না।'

বই দেখে বেরনোর সময় দর্শকেরা দেখেন হল থেকে বেরনোর সব গেট বন্ধ, শুধু একটি গেট খোলা, সেই গেটে পয়সা আদায় করে দর্শকদের বেরোতে দেওয়া হচ্ছে।

এর প্রতিবাদ করায় হলের ম্যানেজার বললেন, 'বিজ্ঞাপনে বলা আছে, প্রবেশমূল্য লাগিবে না। প্রস্থানমূল্য লাগিবে না, কে বলেছে?'

এর চেয়েও অভিনব উপায় আবিষ্কার করেছেন অন্য এক হলের ম্যানেজার। তাঁর ধারণা হল, বাইরে এই বিজ্ঞাপনটি টাঙিয়ে দিলে ভালই দর্শক সমাগম হবে।

বিজ্ঞাপনটি এইরকম :

'হলে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রটি কোথাও,
কখনও, কোনও পুরস্কার পায়নি।'

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে

যে কবি এমন চমৎকার একটি জিজ্ঞাসা রচনা করেছিলেন, তিনি নিশ্চয় জানতেন যে স্বর্গ কোথায়।

অবশ্য অতি শিশুকালে পাঠশালায় পড়ার সময় অন্য এক ছাত্র পাঠ্য কবিতা পাঠ করে আমরা জেনে গিয়েছিলাম, স্বর্গ বা নরক বহু দূরে নয়, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ-নরক রয়েছে।

এখানে এ সব কবিকথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, বরং আমরা আসল স্বর্গ নরকের গল্পে যাই।

সবাই জানেন স্বর্গ ও নরকে প্রবেশ পথের পাশে একটি অফিস ঘর আছে। অফিস ঘরটি বড়, এর একপাশে যমরাজা ও চিত্রগুপ্ত বসেন। আগে নথিপত্র,

দলিল-দস্তাবেজ সব অবিন্যস্ত ছিল। অনেকটা সরকারি অফিসের মত। প্রয়োজনে দরকারি রেকর্ড খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল। ফলে কখনও সখনও ভুল হত, অবিচার হয়ে যেত।

আজকাল আর তা সম্ভব নয়। যমরাজের দপ্তর পুরোপুরি কম্পিউটার ব্যবস্থায় আনা হয়েছে। এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার অকালে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়ে কলকাতা থেকে পরলোকে এসেছিলেন। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি অফিস-কলিগের সঙ্গে নিয়মিত ফস্টি-নস্টি ইত্যাদি করতেন। তাঁর তিন মাস নরকবাস প্রাপ্য ছিল। তাঁর নরকবাস মুকুব করে যমরাজা তাঁকে কম্পিউটারের দায়িত্ব দিয়েছেন।

চিত্রগুপ্ত পুরনো ঘুঘু। দেখে দেখে অনেকটাই শিখে গিয়েছেন। সব মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে নম্বর দেওয়া আছে, প্রয়োজনানুসারে চিত্রগুপ্ত বোতাম টিপলেই নির্দিষ্ট লোকটির কাজকর্মের রেকর্ড বেরিয়ে আসে, তাই দেখে যমরাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অন্যান্য দিনের মত আজ সকালেও যমরাজা অফিস ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে সারা পৃথিবীর হাজার-হাজার সংবাদপত্র। আলগোছে, দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন তিনি। এখনকার মানুষেব পাপকার্যাদির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

যমরাজার চোখে পড়ল কলকাতার কাগজগুলোয় বড় বড় হেডিং, 'শিক্ষা সম্মেলনে বজ্রপাত'। কলকাতার কাছেই কোথায় এক খোলা মাঠে শিক্ষা সম্মেলন হচ্ছিল, শিশুরা অজ-আম-ইট শিখবে নাকি বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে শিখবে কিংবা দুটোই, তাই নিয়ে কুটতর্ক। সেই কুটতর্কের মধ্যখানে বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়। ভয়াবহ ব্যাপার। কতজন হতাহত হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ এখনও সংবাদপত্র দিয়ে উঠতে পারেনি।

যমরাজা খোঁজ নিলেন। বজ্রপাত সভার মধ্যে হয়নি, মঞ্চে হয়েছিল। নিহতের সংখ্যা তিন-চারজনের বেশি নয়। তাঁদের মধ্যে দুজন বলাইবাবু এবং কানাইবাবু যমালয়ে এসে গেছেন।

বলাইবাবু এবং কানাইবাবু দুজনেই মরজীবনে মানে গতকাল পর্যন্ত কলকাতার শহরতলির দুটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

যমরাজা প্রথম বলাইবাবুকে ডেকে পাঠালেন। চিত্রগুপ্ত কম্পিউটারে রেকর্ড চেক করে বলল, 'ভদ্রলোক অধ্যাপক ছিলেন, শেষ বয়েসে, দুবছর আগে কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন।'

যমরাজা সুবিবেচক, সব কিছু খোঁজ খবর রাখেন, বললেন, 'গত দুবছর

তাহলে ভদ্রলোকের খুব ভোগান্তি হয়েছে। খুব কষ্ট করেছেন। কলেজের প্রিন্সিপালের চাকরি দু বছর করা, সে তো সাক্ষাত নরকবাস। বলাইবাবুর আর কোন রেকর্ড দেখতে হবে না। ওঁর অক্ষয় স্বর্গবাস আমি মঞ্জুর করলাম।'

বলাইবাবুর পাশেই ছিলেন কানাইবাবু। তিনি কুড়ি বছর কলেজের অধ্যক্ষতা করেছেন, যমরাজার এই কথার পরে তিনিও বলাইবাবুর সঙ্গে স্বর্গের পথে রওনা হলেন।



চিত্রগুপ্ত তাঁকে থামালেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন।' কানাইবাবু বললেন, 'বলাইদা মাত্র দুবছর প্রিন্সিপালগিরি করেছেন তাই স্বর্গবাস। আমি ওঁর দশগুণ, কুড়ি বছর প্রিন্সিপাল ছিলাম, আমি তো স্বর্গেই যাব।'

চিত্রগুপ্ত যমরাজার দিকে তাকালেন। যম এতক্ষণ সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কানাইবাবু, আপনি কুড়ি বছর প্রিন্সিপালি করেছেন। আপনার নরকযন্ত্রণা অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনাকে নরকেই যেতে হবে।'

তারি লাগি যত

সব মহিলাই পুরুষ বিরোধী নয়। সব পুরুষই মহিলা বিরোধী নয়।

সবাই বাদী বা বিবাদীও নয়। নরবাদী কিংবা নারীবাদী, নরবাদিনী কিংবা নারীবাদিনী এদের সংখ্যা যত তার হাজার গুণ বেশি মানুষ এ সব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এ বিষয়ে আমাকে কেউ প্রশ্ন করলে আমি ব্যাপারটা কায়দা করে এড়িয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গোঁজামিল দিয়ে বলি,

'তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
নারীবাদিনীর শতদলতলে
করিতেছে টলমল।'

এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত হালকাভাবে নেয়া আমার উচিত হচ্ছে না, আমি আশঙ্কান্বিত বোধ করছি। বরং স্বামী-স্ত্রীর পুরনো গল্পে ফিরে যাই।

আদালত দিয়ে শুরু করি।

এক মহিলা বিচারালয়ের শরণাপন্ন হয়েছেন, তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকবেন না, বিবাহ বিচ্ছেদ চান।

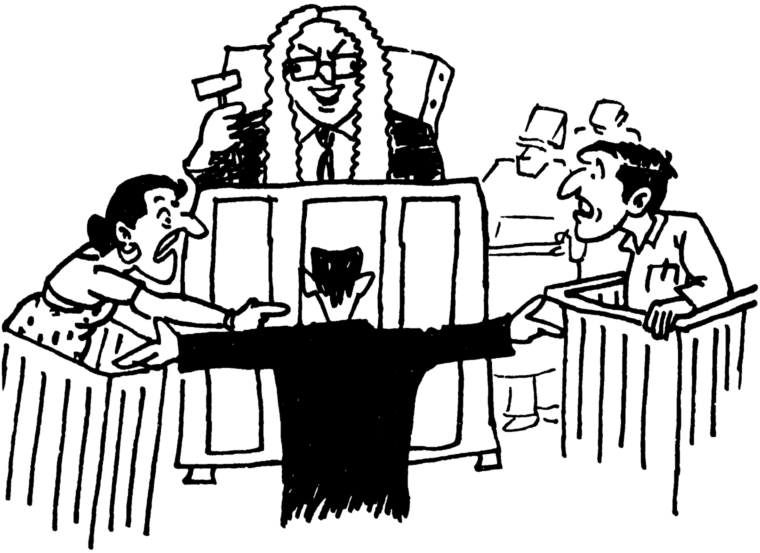
কিন্তু আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের একটা কারণ দর্শাতে হবে। আদালত সে প্রশ্ন তোলায় মহিলাটি বললেন, 'আমার স্বামী আমার প্রতি বিশ্বস্ত নন।'

আদালত যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার প্রমাণ কি?'

একটু ইতস্তত করে মহিলা বললেন, 'দেখুন গত বছর আমার যে ছেলে হয়েছে, আমার ধারণা আমার স্বামী তার বাবা নয়।'

আদালতে আর একটা বিবাহ বিচ্ছেদের গল্প পুরনো এবং বহুকথিত। খুবই

গোলমেলে গল্প। বলাও যায় না আবার না বলে থাকাও যায় না।



বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ হল। বাড়ি, ঘর, টাকা পয়সা, সোনা-গয়না সব কিছু সমান সমান।

কিন্তু গোলমাল বাধলো মোক্ষম জায়গায়। এই দম্পতির তিনটি ছেলে। তিনটি মানবশিশুকে তো আর সমান ভাগে ভাগ করা সম্ভব নয়।

চিন্তিত বিচারক ভ্রূ কুঞ্চন করে দুই পক্ষের উকিলকে বললেন, 'কি করবো বলুন তো? আপনারা কোন পরামর্শ দিতে পারেন?'

দুই উকিল নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারপর বাদিনী ও বিবাদীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, তারপর বাদিনীর উকিল আদালতকে বললেন, 'হুজুর, একটা সমাধান হয়েছে।'

আদালত খুশি হয়ে বললেন, 'কি সমাধান?'

উকিলবাবু বললেন, 'আপনি এই বিবাহবিচ্ছেদ এক বৎসর স্থগিত রাখুন। এরা দুজনে এখন একসঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবে। এক সঙ্গে থাকবে। সামনের বছর এই সময়ে এরা তিনটের স্থলে চারটে সন্তান নিয়ে এখানে আসবে। তখন আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবে বাচ্চাদের দুজন-দুজন করে ভাগ করে দেবেন।'

এর পরের কাহিনী রেল স্টেশনে। একেবারে রেলের কামরার মধ্যে।

লেডিস কামরা। এক পৌঢ়া বসে আছেন। কামরার দরজায় পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ এক যুগল। ট্রেন ছাড়তে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হল। ছেলেটি প্ল্যাটফর্মে ছুটতে ছুটতে হাত নেড়ে বিদায় বার্তা জানাতে লাগলো।

অবশেষে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ট্রেনটি বেরিয়ে আসার পর মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে এসে সিটে বসলো। কপালে, সিঁথিতে ডগমগ করছে সিঁদুর। গায়ে নতুন গয়না নিশ্চয় অল্পদিন আগে বিয়ে হয়েছে।

মেয়েটি আসনে বসার পর তাকে ঐ পৌঢ়া বললেন, 'বাবা কাঁদাকাটি করতে নেই। বরের সঙ্গে তো আবার দেখা হবে। জীবনে বরকে ছেড়ে কত থাকতে হয়।'

চোখ মুছে, গম্ভীর মুখে নবোঢ়া মেয়েটি বললো, 'আপনি ভুল করেছেন, আমি বরকে ছেড়ে যাচ্ছি না, বরের কাছে যাচ্ছি।'

ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা অনেকেই করেন। অনেকে একটু বেশি মাত্রায় করেন।

ভবিষ্যত বিষয়ে চিন্তাভাবনার একটা শর্টকাট হল জ্যোতিষ চর্চা অথবা জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া।

সাধারণত ভবিষ্যতের কথা দু'রকম ভাবা হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং অন্ধকার ভবিষ্যৎ। কিন্তু এর মাঝামাঝি একটা আলো-আঁধারি ভবিষ্যৎ আছে।

এই আলো-আঁধারি ভবিষ্যতের ওপরেই নির্ভরশীল জ্যোতিষীদের জীবিকা। কোনও জ্যোতিষীর কাছে কেউ গেলে জ্যোতিষীরা যা বলেন তা সাধারণত এই রকম : —

ক) 'এখন সময়টা ভাল যাচ্ছে না।' (সময় ভাল গেলে কেই বা জ্যোতিষীর কাছে যায়? শরীর অসুস্থ না হলে কেউ ডাক্তারের কাছে যায়? অবশ্য বাতিকগ্রস্তদের কথা আলাদা।)

খ) 'ছোটবেলায় টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া কিংবা সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল।' (কার হয়নি? জ্যোতিষীরা এমন বলেন ক্লায়েন্টের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে।)

গ) 'সামনে একটা ফাঁড়া আছে।' (যদি দুর্বল মানুষটিকে একটি রত্ন, তাবিজ

বা কবচ ধারণ করানো যায়, সেটা ব্যবহারের পক্ষে ভাল।)

ঘ) 'কিন্তু ফাঁড়া কেটে যাবে। বছর খানেকের মধ্যে ভাল সময় আসছে।' (ক্লায়েন্ট উৎসাহিত বোধ করবেন, হয়তো একটা রত্ন বা মাদুলি ধারণ করতেও পারেন।)



অবশ্য অনেক সৎ জ্যোতিষীও আছেন। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম।

এক জ্যোতিষীর গল্প জানি। তাঁর স্ত্রী কার সঙ্গে যেন পালিয়েছেন। তিনি থানায় গেছেন ডায়েরি করতে।

জ্যোতিষী তাঁর আত্মপরিচয় দিলেন। তাঁর সমস্যার কথা বললেন। থানাবাবু ঘুঘু পুলিশ অফিসার। অনেক ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। তিনি সব কথা মন দিয়ে শুনে তারপর বললেন, 'কিন্তু আপনি তো একজন জ্যোতিষী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই আপনার নখদর্পনে। আপনি বিচার করে বলে দিন, আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে আনবো।'

জ্যোতিষী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ঠাণ্ডা গলায বললেন, 'দেখুন দারোগাবাবু, আমি বিনা পারিশ্রমিকে কোনও গণনা করি না। আপনি আমার ফি দুশো টাকা দিন, আমি এখনই গুণে বলে দিচ্ছি মহিলা কোথায় কার কাছে রয়েছেন।'

থানাবাবু এই কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু গণতকারের পারিশ্রমিক দেওয়ার কোনও রেওয়াজ থানায় নেই। তাই সেই গণতকারের বধূকে উদ্ধার করাও যায়নি।

আমি আমার এক নৈয়ায়িক বন্ধুকে জানি যিনি ভাগ্য, ভবিষ্যৎ কিছুই কোনদিন বিশ্বাস করতেন না। কঠোর বাস্তববাদী সেই সুহৃদ জ্যোতিষ, রত্ন, ভাগ্য, ভবিষ্যৎ হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিতেন।

কিন্তু গত রবিবার সকালবেলা তিনি শুকনো মুখে এসে কবুল করলেন, 'আমি এখন ভাগ্যে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।'

আমরা স্তম্ভিত, কিছুক্ষণ থমকিয়ে থাকার পর বললাম, 'সে কি?'

বন্ধুবর বললেন, 'দ্যাখো, যাদের চিরদিন অকর্মণ্য, অযোগ্য মনে করেছি, যাকে জানি জোচ্চোর সে হয়েছে কো-অপারেটিভ কোম্পানির চেয়ারম্যান। যাকে জানি 'ক অক্ষর গো মাংস', সে হয়েছে ভাইস চ্যান্সেলার, তোমরা এর পরেও বলছো, ভাগ্যে বিশ্বাস করব না। ভাগ্য ছাড়া এসব কিসে হয়?'

খাই-খাই

মধ্যবয়েসে একবার শরীরের মধ্যপ্রদেশ স্ফীত হতে শুরু করলে, তার আর শেষ নেই। মোটা থেকে আরও মোটা তারপর আরও মোটা। একবার আরম্ভ হয়ে গেলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব।

অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির ব্যাপারটা অনেকে শারীরিক নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মেনে নেন। আবার কেউ কেউ মানতে চান না। মেদবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম শুরু করেন।

সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বড় হোটেলের জিমে যান, হেলথ ক্লাবে যোগদান করেন। অনেক ব্যক্তি আবার বেশি বয়েসে ক্লাবে গিয়ে টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলা আরম্ভ করেন। কেউ কেউ স্টিক হাতে গলফ্ লিঙ্কে যান।

অন্যেরা যারা পয়সা খরচ করতে চায় না কিংবা করে না তারা লাফায়, ঝাঁপায়। অনেকে হাঁটে, জগিং করে, দৌড়ায়। এবেলা-ওবেলা দেড়-দুই ঘণ্টা সময় যায়।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। ওজন যথারীতি বেড়ে চলে, মেদবৃদ্ধি বন্ধ হয়

না, ভুঁড়ি হ্রাস পায় না।

অবশেষে একদিন হাঁসফাঁস করতে করতে শ্রীযুক্ত মেদবান ডাক্তারবাবুর কাছে যান। ডাক্তারবাবু দেখে টেখে বলেন, 'ব্যায়াম-ট্যায়াম ঠিক আছে। শুধু ওতে হবে না। আপনাকে খাওয়া কমাতে হবে।'

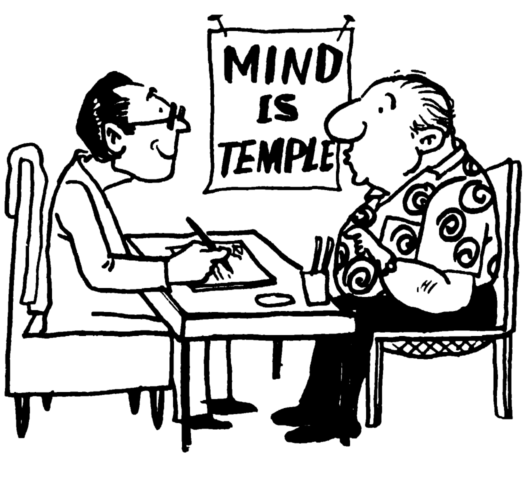
খাওয়া কমানোর কথা বললেই মেদবানবাবুর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তিনি ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

অতঃপর অন্য ডাক্তার। সান্ত্বনা এই যে, তিনি নিজেও স্থূলাকার। তিনি বলেন, 'আমাদের তিরিশ কেজি ওজন কমাতে হবে।'

মেদবান ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, আপনি পনেরো কেজি আর আমি পনেরো কেজি।'

এর পরের ডাক্তার একটু অন্যরকম বলেন, তিনি জানান, 'দেখুন এটা আপনার মানসিক ব্যাপার। ওসব দৌড়ে-টৌড়ে কিছু হবে না। সেই কবিতা পড়েছেন নিশ্চয়, ময়দানে একটা রোগা লোক প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে মোটা হওয়ার জন্য আর একটা মোটা লোক প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে রোগা হওয়ার জন্য।'

ডাক্তারবাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেদবান বললেন, 'ডাক্তারবাবু, এ রঙ্গরসিকতার সময় নয়। আমাকে ঠিক কি করতে হবে, দয়া করে বলুন।'



ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার মনোসমীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অকারণ কেন আপনার এত খাই-খাই ভাব সেটা জানতে হবে।' এই বলে ডাক্তারবাবু নিজের প্যাড বার করে তাঁর এক বন্ধু মনের ডাক্তারকে একটা চিঠি লিখে মেদবানের হাতে দিলেন। বলে দিলেন ফোনে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে।

পরের সপ্তাহে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুসারে মনোসমীক্ষকের চেম্বারে মেদবানবাবু গেলেন। বহুক্ষণ ধরে সিটিং, প্রায় দেড়ঘণ্টা হয়ে যায়। তবে নরম কোচ, হালকা নীল আলো, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ মেদবান চোখ বুজে শুয়ে, সারাদিন কি খান, কি করেন ডাক্তারের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

অবশেষে ডাক্তারবাবু বললেন, 'দেখুন আপনি একজন কমপালসিভ ইটার (Compulsive eater), বাধ্যতামূলক খাদক। আপনি যা কিছু করেন সবই খাওয়ার জন্যে। আপনি ঘুম থেকে ওঠেন প্রাতরাশের লোভে। আপনি পার্কে হাঁটতে যান আইসক্রিম খাওয়ার জন্যে। আপনি অফিস যান দুপুরে টিফিনে মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস খাওয়ার জন্যে। আপনি বাড়ি ফেরেন গলির মুখের রামকৃষ্ণ সুইটসের রাধাবল্লভী আর রাজভোগ খাওয়ার জন্যে।'...

এইসময় ডাক্তারবাবুকে থামিয়ে দিয়ে মেদবান বললেন, 'ডাক্তারবাবু, এত খাবারের কথা শুনে আমার মাথা চনমন করছে। কিন্তু এই যে দেড়ঘণ্টা ধরে সিটিং, আপনার পাঁচশো টাকা ভিজিট। এতক্ষণ ধরে প্রশ্নোত্তর। একটু স্ন্যাকস দেবেন না, ওমলেট, কাটলেট, স্যান্ডউইচ, সিঙ্গারা, নিমকি, খাস্তা কচুরি। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, যা হোক একটা কিছু দেবেন তো।'

ক্ষুধা

এটি একটি বিখ্যাত গল্প। দুই বুদ্ধিজীবীর নামে বহুকাল ধরে চলছে। কাল্পনিক এই দুই বুদ্ধিজীবীর একজন খুবই মোটা এবং অন্যজন খুবই রোগা। যদি সাহেব মতে ভাবা যায়, কখনও এঁরা স্থূলার্থে চার্চিল কিংবা চেষ্টারটন, সূক্ষ্মার্থে বার্নার্ড শ কিংবা লর্ড মাউন্টব্যাটেন। যদি ভারতীয় ভাবেন, আগা খাঁ এবং গান্ধীজি, বাঙালি হলে ফজলুল হক আর ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। অতি রোগা এবং অতি মোটা লোকের

উদাহরণের জন্যে হাপিত্যেশ করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। অতি মোটার উদাহরণ হিসেবে আমি নিজেকে উপস্থাপন করছি, আপনারা অতি সহজেই অতি রোগার স্যাম্পল জোগাড় করুন, সে খুব কঠিন কাজ নয়।



সে যা হোক, এই গল্পে এসব অতিশয় অবান্তর ব্যাপার। যে কোনও পূর্ব পরিচিত দুই বন্ধু, একজন মোটা, একজন রোগা, এদের নিয়ে আসল কাহিনী। মোটাবাবু আর রোগাবাবু পুরনো বন্ধু, একদা সহপাঠী ছিলেন। পঁচিশ বছর পরে তাঁদের দু-জনের আবার দেখা হয়েছে। একদা দু-জনার চেহারা, নবযুবক বয়েসে প্রায় একই ছিল, যেমন হয়, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কেজি ওজন।

বয়েস বাড়তে একজন রোগা হয়ে গেছেন, তাঁর ওজন দাঁড়িয়েছে চল্লিশ কেজি, ইনি আবার খুব লম্বা ফলে তাঁকে প্যাকাটির মত দেখাচ্ছে। অন্যদিকে অন্যজনের ওজন বেড়ে হয়েছে একশো কেজি, তিনি আবার বেঁটে। একেবারে কুমড়ো-পটাশ যাকে বলে তাই আর কি।

বলা বাহুল্য, এঁরা দুজনেই নিজেদের আকার আয়তন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। পরস্প্রবের সঙ্গে দেখা হতে দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলেন। এইবার মোটা বন্ধু রোগা বন্ধুকে বললেন, 'এ কি চেহারা হয়েছে তোর? এত রোগা হলি কি করে? তোকে দেখে মনে হয় দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে।'

সুরসিক রোগা বন্ধুটি (গল্পকথায় তাঁকে অনেক সময় বার্নার্ড শ বলে চিহ্নিত করা হয়) বঙ্কিম হেসে পুরনো বন্ধুকে বললেন, 'আর তোকে দেখলেই লোকে বুঝতে পারবে সেই দুর্ভিক্ষের কারণটা কি।'

ঠিক এরই কাছাকাছি অন্য একটা গল্প সম্প্রতি শুনেছি। এটা অবশ্য নির্ভেজাল ক্ষুধার গল্প।

কলকাতার বাইরের এক মফস্বল শহর থেকে এক হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক কলকাতায় আত্মীয়বাড়িতে প্রায় অনাহূতভাবে এসে উঠেছেন।

সে যা হোক, তিনি বললেন, 'তাঁর খিদে হয় না, তার জন্য খাবারদাবারের বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হবে না। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা গেল ভদ্রলোক রীতিমত খাদক। ফ্রিজে পুরো পরিবারের দুদিনের খাবার ছিল। সে সবই দুবেলায় উধাও হয়ে গেল।

সারা মাসের বাজারের টাকা অতিথি ভদ্রলোকের কল্যাণে সাতদিনেই ব্যয় হয়ে গেল। অবশেষে আট দিনের মাথায় ভদ্রলোক বাক্স-বিছানা গুছিয়ে রওনা হলেন।

না, তিনি তাঁর শহরে ফিরলেন না। তিনি যাবেন মাদ্রাজে, যার আধুনিক নাম চেন্নাই।

গৃহকর্তা ভদ্রতাবশত অতিথিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গরমে মাদ্রাজে যাচ্ছেন?'

অতিথি বললেন, 'কি করব বল? কলকাতায় তো ভাল চিকিৎসা হয় না আজকাল। মাদ্রাজেই যেতে হচ্ছে।'

গৃহকর্তা বললেন, 'কি হয়েছে আপনার? কিসের চিকিৎসা করাবেন?'

অতিথি বললেন, 'ক্ষুধামান্দ্য। একেবারে খিদে হয় না। দেখলে না এ কয়দিন?'

কথোপকথন

হাসির বাজারে বড় মন্দা চলছে। এই খর গ্রীষ্মের দিনে এমন কিছু ঘটছে না যা নিয়ে রসিকতা করতে পারি।

অগত্যা দুটি প্রাচীন গল্পের শরণাপন্ন হচ্ছি। বৈচিত্র্যের তাগিদে গল্প দুটি

কথোপকথনের কায়দায় সাজিয়ে দিচ্ছি।



(এক) রাম-শ্যাম

রাম : তোমার কাছে একটা ভাল চিঠি লেখার কাগজ হবে, শ্যাম? ওই রঙিন পেপার কিংবা পুরু সাদা রুলটানা কার্টিজ?

শ্যাম : (ড্রয়ার হাতড়িয়ে একটা রাইটিং প্যাড বের করে এগিয়ে দিয়ে) এই নাও।

রাম : ওই যে ফরাসি পারফিউমটা তুমি জামায় রুমালে মাখো সেটা এক ফোঁটা দেবে?

শ্যাম : (তাকের ওপর থেকে ফরাসি সেন্টের শিশিটা নামিয়ে রামের দিকে এগিয়ে দিয়ে) এই নাও।

রাম : (কয়েক ফোঁটা সুগন্ধ হাতের আঙুলে করে চিঠি লেখার কাগজে মাখিয়ে দু-তিনবার শুঁকে নিয়ে পরিতৃপ্ত মুখে) ভালো লেখা হয় এমন একটা কলম দাও তো।

শ্যাম : (নিজের পকেট থেকে একটা দামি বিলিতি ফাউন্টেন পেন এগিয়ে দিয়ে) এই নাও।

রাম : এতই যখন সাহায্য করলে একটা রঙিন খাম দাও তো।

শ্যাম : (অনেক খুঁজে এক ফিকে নীল রঙের খাম বের করে এগিয়ে দিয়ে) আর কিছু?

রাম : (নিবিষ্ট মনে চিঠি লিখতে লিখতে খামটা শ্যামের হাত থেকে নিয়ে চিঠিটা ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে) আচ্ছা, তোমার কাছে দু-টাকার স্ট্যাম্প আছে?

শ্যাম : না।

রাম : সে যাক। বাজারের পাশেই তো ডাকঘর। তুমি বাজারে যাওয়ার সময় ডাকঘরে একটা দু-টাকার স্ট্যাম্প কিনে খামটায় লাগিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিও।

শ্যাম : (ঠিকানাহীন খামটার দিকে অপলক দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে) আর কিছু?

রাম : হ্যাঁ, ভাল কথাটা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি। কাল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে লাল রঙের শালোয়ার আর কামিজ পরা, শ্যাম্পু ফাঁপানো চুলের যে মেয়েটাকে তোমার সঙ্গে দেখলাম, তার নাম আর ঠিকানাটা একটু বলতো।

(দুই) প্রৌঢ় ও যুবক

ঘটনাস্থল একটি প্রাচীন অভিজাত ক্লাবের বারান্দা। সময় প্রায় মধ্যরাত্রি।

এক বিশালকায়, বিশাল ভুঁড়ি প্রৌঢ়ের সঙ্গে এক সুদর্শন যুবক অসংলগ্ন কথাবার্তায় ব্যস্ত।

যুবক : ওই যে মেয়েটা আমাকে গেলাস ছুঁড়ে মারল, জানেন ওকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি।

প্রৌঢ় : এর পরেও কি তুমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করবে?

যুবক : আলবাত করব। কেন করব না।

প্রৌঢ় : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) জানো আমিও একবার ভালবেসেছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম যে মেয়েটি আমার উপযুক্ত নয়।

যুবক : ভাগ্যিস মেয়েটিকে বিয়ে করেননি।

প্রৌঢ় : বিয়ে করিনি কে বলল? শুধু বিয়ে করেছি তা নয়, আজ তিরিশ বছর ধরে তার সঙ্গে ঘর করছি।

যুবক : তা হলে?

প্রৌঢ় : তা হলে আর কি? বিয়ে করার পরে তো বুঝলাম সে আমার যোগ্য নয়। কিন্তু তখন তো খুব দেরি হয়ে গেছে।

ম্যালেরিয়া

যতদূর মনে পড়ে ম্যালেরিয়া বিষয়ে গত বছরেও লিখেছি এবং তার আগের বছরেও লিখেছি। হয়তো সামনের বছরেও লিখতে হবে। ভালই হয়েছে, দোল-দুর্গোৎসব, বড়দিন, নববর্ষের মত কলমকারদের আরও একটা বাঁধা নিবন্ধের জোগাড় হয়েছে।

ম্যালেরিয়া শব্দটি ইংরেজি নয়। এটি একটি ইতালিয়ান শব্দ, যার অর্থ হল খারাপ বাতাস।

সে যা হোক গত পঁচাত্তর বছরে, বিশেষ করে উনিশশো তিরিশের দশক থেকে ম্যালেরিয়া খাঁটি বাংলা শব্দ হয়ে গেছে। সুদূর গ্রামান্তরের নিরক্ষর মানুষ থেকে সবাই এই শব্দটি জানে। এটা যে একটা ভয়াবহ অসুখ সেটা হাড়ে হাড়ে জানে।

বলা যায়, ম্যালেরিয়া বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ডাল-ভাত হয়ে গেছে। ডাল-ভাত যেমন বাঙালির ঘরের খাদ্য, ম্যালেরিয়া তেমনি বাঙালির ঘরের অসুখ। রাজাউজির থেকে চাষাভুষো সকলের প্রতিই ম্যালেরিয়ার সমান আকর্ষণ।

আমার এক চিকিৎসক বন্ধু সেদিন বললেন, ম্যালেরিয়া অসুখটা হল বিশ্বস্ত ও অনুগত, পোষা জন্তুর মত যতদূরে যেখানেই যাক, যথাসময়ে বাঙলার ঘরে ফিরে আসে।

আমাদের এতকালের দুঃখের ম্যালেরিয়া, তার বিষয়ে একটা গল্প বলি।

গল্পটা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শোনা যায়।

এটা তিরিশের দশকের, মানে কমবেশি সত্তর বছর আগের কথা। সেকালের চিকিৎসায় জ্বর হলে ভাত খাওয়া বারণ ছিল।

জ্বরের সময় আমরা বার্লি খেতাম। লিলি বার্লি, রবিনসনের বার্লি ইত্যাদি।

সেই সব বার্লির বিজ্ঞাপন যতই চিত্তগ্রাহী হোক, সেই সব বার্লির পানীয়ে যতই কাগজি লেবুর রস বা মিছরি দেওয়া হোক তার চেয়ে বিস্বাদ, পানসে পানীয় বিশ্বসংসারে দুর্লভ।

কম্প দিয়ে জ্বর আসলে ভাদ্রমাসের তাল পচা গরমেও আমরা হুহু করে কাঁপতে কাঁপতে লেপ-কম্বলের নিচে চলে যেতাম।



জ্বরের মেয়াদ সাধারণত ছিল তিনদিন। তিনদিনের মাথায় প্রচুর ঘাম, ঘামের জলে বিছানা বালিশ ভিজে যেত, তখন জ্বর ছাড়ত।

প্রথম দু'দিন পথ্য ছিল শুধু সাবু-বার্লি। তৃতীয়দিন দুপুরে রুটি তার সঙ্গে গাঁদাল পাতার বা আদা দিয়ে বাচ্চা জিওল মাছের ঝোল।

ভাত খাওয়ার জন্যে মনটা হুহু করত। যদি চতুর্থদিনে জ্বর না আসত মণ্ড মতন অল্প গলা ভাত পাওয়া যেত।

তবে অনেক সময় জ্বর ছেড়ে গিয়ে চতুর্থদিনে আবার আসত। এর নাম ছিল পালাজ্বর। ম্যালেরিয়ারই রকম ঢের। এর জন্যে চতুর্থদিনের সেই বহু আকাঙ্খিত অন্নপথ্য করা আর হত না। এরই জন্যে জিজ্ঞাসা ছিল, 'ভাত খেয়েছেন?'

যিনি ম্যালেরিয়া অঞ্চলের লোক নন, তাঁর পক্ষে এই প্রশ্নের কারণ ও অর্থ

বোঝা কঠিন।

শরৎচন্দ্র গেছেন কৃষ্ণনগর শহরে। পুরো কৃষ্ণনগব শহর তখন ম্যালেরিয়ায় কম্পমান। স্টেশনে, বাজারে, রাস্তাঘাটে, অফিস কাছারিতে, স্কুল-কলেজে লোকজন অতি বিরল। সবাই কম্বলের নিচে কাঁপছে।

রাস্তায় কচ্চিৎ যে দুয়েকজন লোককে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতেই দু'জনে দুজনকে একই প্রশ্ন করেছে, 'ভাত খেয়েছেন?'

সবাই ম্যালেরিয়া গ্রস্ত। যারা জ্বরে ভুগছে তারা বিছানায় পড়ে আছে। আর যারা জ্বর থেকে উঠেছে, অন্নপথ্য করেছে, তারাই পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে প্রচলিত কুশল প্রশ্নের বদলে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ভাত খেয়েছেন?'

সুবুদ্ধি, সুরসিক শরৎচন্দ্র স্টেশন থেকে জ্বর জর্জর এক বৃদ্ধ কোচম্যানের ফিটন গাড়িতে চড়ে নির্দিষ্ট আবাসে যেতে গিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন, তারপর তাঁকে দেখে গৃহকর্তা বাড়ির ভেতর থেকে এগিয়ে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাত খেয়েছেন তো?'

অভিনয়

'অভিনয় নয় গো অভিনয় নয়'। যাঁদের ষাটের এপাশে-ওপাশে বয়েস, যাঁরা শহর, শহরতলী, গঞ্জ বা মফস্বল শহরে চল্লিশের দশকে কৈশোরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণ হারমোনিয়ামের ধুলো ঝেড়ে দুয়েকটা রিড টিপলেই 'অভিনয় নয় গো অভিনয় নয়' একটা-একাই পুরনো কালের আটাত্তর আর পি এমের রেকর্ড ঘুরে যাবে, চোঙা গ্রামাফোনের ছত্রছায়ায়।

হায় আটাত্তর আর পি এম, হায় গ্রামাফোন, চোঙা গ্রামাফোন! আজ আর কোথাও কিছু নেই, তবু মনের মধ্যে বাজছে।

'অভিনয় নয় গো অভিনয় নয়।'

এই ক্ষুদ্র রম্য নিবন্ধে, যে নিবন্ধের নাম অভিনয়, এখানেই একজন বিস্মৃতা অভিনেত্রীকে স্মরণ করি, তিনি সেকালের জনপ্রিয় সুরসিকা গুলফন হরি।

শ্রীমতি হরি কলকাতার পেশাদার স্টেজে অর্ধেন্দু মুস্তাফির বিপরীতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে, বহুকাল অভিনয় করেছেন, তাঁর জাত, ধর্ম, পরিচয় কিছুই জানি না, জানার প্রয়োজনও নেই। অভিনেত্রীর কোন জাত-ধর্ম নেই।

তা বিখ্যাত অভিনেত্রী অর্ধেন্দু মুস্তাফি এবং শ্রীমতি হরি একটি নাটকে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। শ্রীমতির সন্দেহবাতিক, সব সময়ে ঝাঁটা হাতে এদিক-ওদিক থেকে স্বামীর প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। হাতে নাতে স্বামীকে ধরে ফেলতে হবে।

এদিকে সেই সন্ধ্যায় এক নাট্যরসিক ইহুদি সাহেব এসেছেন রঙ্গালয়ে। তিনি আসন গ্রহণ করে সুন্দরী গুলফন হরিকে একটি ফুলের মালা ছুঁড়ে দিলেন। অভিনেত্রী কম স্মার্ট নন। সেই মালাটি লুফে নিয়ে নিজের গলায় পড়লেন।



একটু পরেই মঞ্চে অর্ধেন্দু মুস্তাফির প্রবেশ। তিনি মাল্যবতী নায়িকাকে দেখে আজ নিজেই উলটো অভিনয় করলেন, 'আমাকে এত সন্দেহ। তা এই যে বাহারের মালাটি গলায় দিয়েছো এটি কে দিলে?'

এই ডায়ালগ নাটকের বাইরের কিন্তু শ্রীমতি কম যান না, দর্শক আসনের ইহুদি সাহেবকে দেখিয়ে নায়িকা বললেন, 'মালা দিয়েছে, আমার নন্দাই, ওই যে ওখানে বসে।'

মঞ্চে উপস্থিত বুদ্ধি এবং বাকচাতুর্যের এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

এ রকম আর একটি দৃষ্টান্ত অর্ধেন্দু শেখরেরই রচনা।

একটি নাটকের এক দৃশ্যে অর্ধেন্দু তাঁর চাকরকে ডাকছেন, 'হরে, এই হরে,

কোথায় গেলি?' হরে আসতে দেরি করছে, উইংসের দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকছিলেন।

এমন সময় হলের ভিতর থেকে এক ফাজিল দর্শক বলে বসল, 'আজ্ঞে যাই।' সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেন্দু বললেন, 'আরে ব্যাটা তুই কাজকর্ম ফেলে নাটক দেখছিস!'

থিয়েটারের মজার গল্পের শেষ নেই।

অর্ধেন্দু মুস্তাফির পরে রসরাজ অমৃতলালের একটা গল্প বলি।

মতিলাল নামে এক ধনী ব্যক্তি রসরাজের দলে অভিনয় করতেন। তাঁর সঙ্গে চাকর থাকত। চাকরের নাম একলু, একলু একটু বোকাথোকা ধরনের লোক।

একলুকে রসরাজ একা পেয়ে আজ বোঝালেন,

'দ্যাখো, তোমার একলু নামটা ভালো নয়। আজ থেকে তোমার নাম বাখলাম চামচিকে।' একলু সানন্দে রাজি হল। কিন্তু পরে মতিলালবাবু বুঝতে পারেন এর নিহিত অর্থ কি? ছুঁচোর গোলাম চামচিকে। তার মানে তিনি ছুঁচো। অতঃপর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র দূরদর্শনে (কলকাতা চ্যানেল) একদা বলেছিলেন, 'সব মানুষই অভিনয় করে, অভিনয় করতেই হয় মানুষকে। বাড়িতে হয়ত কেউ এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না। বিরক্ত হচ্ছি। কিন্তু তবু তাঁকে বলছি, 'এখনই চলে যাচ্ছেন। আরেকটু বসুন। এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।'

অবশ্যই মানুষের জীবন যে একটা নাটক, জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষ-মানুষী, অভিনেতা-অভিনেত্রী মাত্র এ কথা মহামতি শেক্সপীয়ার বহুকাল আগে ব্যাখ্যা করে বলে গেছেন।

রসিক সুভাষচন্দ্র

এই ঘনঘোর বর্ষায় একটি নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে, 'রসিক সুভাষচন্দ্র'। গ্রন্থটির রচনাকার হিরন্ময় ভট্টাচার্য একজন কৃতবিদ্য পুরুষ, তাঁর 'রসিক শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের জন্যে তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে বিশেষ রূপে খ্যাত।

শ্রীভট্টাচার্য বহুদিন কর্ম উপলক্ষে লণ্ডন প্রবাসী ছিলেন, সেখান থেকে বাংলা পত্রিকা প্রচলন করতেন 'সাগর পারে'। সে পত্রিকাও এপার-ওপার দুই বাংলাতেই সুপরিচিত ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকেরা অনেকেই সময়ে-সময়ান্তরে সেখানে লিখেছেন।

সে যা হোক এই 'রসিক সুভাষচন্দ্র' বইটি আমাদের একটা উপকার করল। জনমানসে অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা ফৌজি পোশাকে কিংবা গোল চশমা, গান্ধী·টুপি মাথায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের যে ছবি রয়েছে এই বইয়ে সে সবের পাশাপাশি এক সহাস্য, সরস সুভাষচন্দ্রকে পাওয়া গেল।

প্রথমেই একটা উদাহরণ দিই।



সরকার-নিষিদ্ধ এক মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যথারীতি বিচার হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রায় দিলেন, ছয়মাসের কারাবাস।

ক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র রায় শুনে তির্যক হেসে বললেন, 'মাত্র ছয় মাস। আমি কি মুরগি চুরি করেছি।'

* * * * *

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খুব পান খেতেন, নিজের হাতে পান

সাজাতেন। কেউ কিছু বললে বলতেন, 'জানিস না, আমি যে মেদিনীপুরের উড়ে।'

সুপুরি-মশলার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রও ব্যাতিক্রম নন। অনিল চন্দের বাড়ির আড্ডায় দেখা গেছে সুভাষচন্দ্র মুঠো-মুঠো সুপুরি খাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান কটকে তাই তিনি বলতেন. 'আমি মশায় ওড়িশার লোক। সুপুরি ছাড়া আমার চলবে কি করে?'

শুধু সুপুরি নয়, মশলার ওপরেও ছিল নেতাজীর বিশেষ দুর্বলতা।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন,

'সুভাষবাবু ভাজা মশলা খেতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর মেজবউদি সে বস্তুটি নিয়মিত সরবরাহ করতেন। আড্ডার সময় চায়ের পাট চুকলে তাঁর পকেটের সযত্ন রক্ষিত মোড়ক থেকে মশলা বার করে নিজেও খেতেন এবং অন্যদেরও দিতেন, কেউ বঞ্চিত হোত না।

কিন্তু এ ব্যাপারে একটা গোলমাল ছিল। সুভাষ সবাইকেই মশলা বিতরণ করতেন বটে। পকেট থেকে অতি সন্তর্পনে কাগজের মোড়কটি খুলে খুবই সামান্য পরিমাণ সঙ্গীদের হাতে দিতেন, তাও যেন সুভাষচন্দ্রের হাত উঠত না।

একদিন মশলা ভাগের সময় কিরণশঙ্কর রায় হাসতে হাসতে বললেন, 'সুভাষবাবু, ভারতবর্ষটা আমাদের হাতে এলে আমাদের ভাগবাঁটোয়ারাটা কি আপনি এই রকমই করবেন?'

কিরণশঙ্করের এই রসিকতায় সুভাষচন্দ্র হো হো করে হেসে ফেললেন, তারপর হাসি থামিয়ে কিরণশঙ্করকে বললেন, 'ভবিষ্যতের সে বস্তুটির চেয়ে বর্তমানের এই বস্তুটির প্রতি আমার লোভটা আপাতত বেশি। তবে ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমার ওপরে আপনারা অনায়াসেই নির্ভর করতে পারেন।

পুনশ্চ ঃ

যদিও সুভাষচন্দ্র ঘটিত নয়, এ বইয়ে ইংরেজ বিরোধী দুটি রসিকতা অসামান্য।

প্রথমটি সুভাষচন্দ্রের বন্ধু শরৎচন্দ্র দত্তের পরিচিত এক ভদ্রলোক মেম বিয়ে করেছিলেন, সেই ভদ্রলোককে শরৎচন্দ্র সাধুবাদ জানিয়েছিলেন এই কারণে যে সেই মেয়ের স্বামী বলেছিলেন, 'আমি মেম বিয়ে করেছি কেন জানিস? শুধু সাহেবদের 'শালা' বলতে পারব বলে।'

পরের কাহিনীটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের। দেশবন্ধু তখন সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। ফিনফিনে ধুতি ছেড়ে মোটা খদ্দর ধরেছেন। তবে বিলিতি পাম-সু তাঁর পায়ে তখন ছিল। এক আত্মীয় এই বিলিতি জুতোর বিষয়ে কটাক্ষ করেন।

চিত্তরঞ্জন বাকসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিলিতি জুতো

বলেই তো পায়ের তলায় রেখেছি।'

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে

উইল করার সময় প্রথমেই লিখতে হয়, 'আমি এই উইল স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে করলাম।' অর্থাৎ কারো চাপে পড়ে বা জোর জবরদস্তিতে নয়, কারো উপরোধে অনুরোধে নয়, এমন কি ঝোঁকের মাথায় কিংবা রাগ করে নয়, রীতিমত ঠাণ্ডা মাথায়, সুচিন্তিত ভাবে আমি এই উত্তরাধিকারনামা প্রণয়ণ করলাম।

এ রকম বয়ান উইলের ভূমিকায় আশা প্রয়োজন আছে। কারণ অনেক উইল পড়েই মনে হয় পাগলের প্রলাপ। সতীসাধ্বী স্ত্রীকে বছরে পাঁচশো টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করে রক্ষিতাকে গাড়ি, বাগানবাড়ি, ভূসম্পত্তি, শেয়ার, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সর্বস্ব দিয়ে গেছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা মুষ্ঠিমেয় নয়।

এমন কি বিধবা কন্যা কিংবা বিকলাঙ্গ পৌত্রকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি পোষা ময়না বা মেনিবেড়ালের নামে লিখে দিয়ে গেছেন এমন লোকের খবর অনেক সময়েই সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

অবশ্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বাগবাজারের রসিক রায়চৌধুরীর উইল বা ইচ্ছাপত্র। তিনি তাঁর সমস্ত কিছু ঐহিক বিষয় সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় 'নিখিল বাংলা অনাথ আশ্রমে' দান করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সবাই, বিশেষ করে সংবাদপত্রসমূহ রসিকবাবুর উচ্চ প্রশংসা করেছিল।

কিন্তু রসিকবাবুর মৃত্যুর পরে দেখা যায় যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নেই, থাকার মধ্যে আছে দুটি নাবালক পুত্র এবং তিনটি নাবালিকা কন্যা। অবশেষে বোঝা গেল, তিনি এই পুত্র কন্যাদের অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছেন।

এক উকিলবাবুর করুণ কাহিনী এই সূত্রে মনে পড়ছে।

উকিলবাবু তাঁর এক বড়লোক মক্কেলের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে উইল রচনায় সহায়তা করছিলেন। মক্কেল বিশাল বড়লোক। কত যে তাঁর বাড়ি-গাড়ি, ফ্ল্যাট, জমিজমা, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা, শেয়ার তার কোনো শেষ নেই।

উকিলবাবু লিখে চলেছেন তো লিখেই চলেছেন।

...'পঁচিশ লাখ পাবে আমার বড়ছেলে, আমার মেজছেলে খালি কবিতা লেখে, সে কোনো কর্মের নয়। সে পাবে পঁচিশ হাজার। আমার ছোটছেলে মেম বিয়ে

করেছে, তাকে কিছুই দেব না। আমার কুকুর টাইগারের ভরণপোষণের জন্যে থাকবে এক লাখ টাকা, আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য চাঁদু ঐ টাকাটা পাবে সেই সঙ্গে তার নিজের জন্যে আরো এক লাখ। ...'

এই পর্যন্ত ভালই চলছিল, উকিল লিখে যাচ্ছিলেন হঠাৎ বৃদ্ধের কি মতলব হলো, বললেন, 'উকিল তুমিও তো আমার জন্যে অনেক কিছু করেছো, তোমাকেও কিছু টাকা দেই।'



উকিলসাহেব খুব খুশি হয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'সে আপনার দয়া।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তা হলে তোমার নামে লেখো পঁচিশ হাজার।' তারপর বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'পঁচিশ হাজার বড় কম হয়ে যাচ্ছে, লেখো এক লাখ।'

উকিলসাহেব 'পঁচিশ হাজার' কেটে আনন্দে ও উত্তেজনায় কম্পিত হস্তে 'এক লাখ' লিখলেন। ততক্ষণে বৃদ্ধ মনে মনে আরো একটু এগিয়েছেন, 'এ বাজারে এক লাখেই বা তোমার কি হবে, লেখো দশ লাখ।'

'দশ লাখ!' উকিলসাহেবের পক্ষে আব লেখা সম্ভব হল না। মুখে একটা 'ওক্' শব্দ করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে সশব্দে মেঝেতে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

পুনশ্চ :

' সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় শুধুই যে উইল বা ইচ্ছাপত্র রচিত হয়, তা নয়; আরো অনেক গোলমেলে ব্যাপার ঘটে।

গঙ্গারামকে মনে আছে তো আপনাদের, আমাদের সেই বোকা-চালাক, সরল গঙ্গারাম। আপনার জানলে খুশি হবেন, গঙ্গারাম মাস দুয়েক হলো একটা চাকরি পেয়েছে, সরকারি অফিসে ছোট কেরানীর চাকরি। তাই বা এ বাজারে কম কি?

গঙ্গারামের সিট হয়েছে বড়সাহেবের হাফডোরের ঠিক উল্টো দিকে। তিনি ভালো ধরনের, সাদাসিধে মানুষ। তিনি দৈনিক টিফিনের সময় দেখেন, গঙ্গারাম তার টিফিনবাক্স খুলে রুটি আর আলুভাজা খায়, আর আক্ষেপ করে আবার সেই রুটি আর আলুভাজা।

দিনের পর দিন এই দৃশ্য দেখে অবশেষে হাফডোর পেরিয়ে এসে বড়সাহেব বললেন, 'তুমি প্রত্যেকদিন আফশোষ কর কেন? বাড়িতে বললেই পারো অন্য কিছু টিফিন দিতে।'

গঙ্গারাম বলল, 'স্যার, বাড়িতে আমি একাই। টিফিন আমিই বানিয়ে আনি।'

খাওয়া-দাওয়া

আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে ঝকঝকে কাঁসার থালা। সে থালার উত্তর-পূর্ব দিগন্তে ঘন সবুজ এক টুকরো গন্ধরাজ লেবু, পাশে সদ্য ফোঁটা জুঁই ফুলের মত একটু নুন। এক বাটি কালজিরে চালের সুগন্ধি ভাত, সেই সঙ্গে নারকেল দেয়া মুগের ডাল, এক চামচে গরম ঘি, পটল বা আলুভাজা। একটা হালকা নিরামিশ তরকারি কিংবা প্রথম পাতে ঘিয়ের আগে ডালের বড়ি দিয়ে কাঁচকলা উচ্ছে সুক্তো। ছোট মাছ, ট্যাংরা কিংবা পুটি মাছের ঝাল, তারপর তেল কই কিংবা ঘি-গরম মশলা দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল, অবশ্য পাকা রুই মাছের কালিয়া বা সঙ্গে ইলিশ হলেও চলবে। এর পরে চাটনি, আম বা আলু বখরার, ঋতু বিশেষে আমড়া বা জলপাইও ভাল। এরপর একটু টক দই চিনি দিয়ে সঙ্গে মরণ চাঁদের সন্দেশ অথবা পোড়াবাড়ির চমচম।

এই হলো আমার আদর্শ মধ্যাহ্ন ভোজের ধারণা। অবশ্য তামসিক আহারেও আমার আপত্তি নেই। ওয়েলেসলি স্ট্রিট- রিপন স্ট্রিটের মোড়ে কলকাতায় কাঠ

কয়লার তোলা উনুনে সেঁকা আমজনতার শিক কাবাব দুটো তন্দুরি রুটি সঙ্গে এক টুকরো লেবু, একটা কাঁচালঙ্কা, সাত আট টাকার এই ডিনারও আমার খুব পছন্দ।

পাঠিকা সাহেবা হাসবেন না। আমি যে লোভী মানুষ সে তো চেনা-শোনা সকলেই জানে, আপনিও না হয় জানলেন।

স্বদেশ-বিদেশের কত রকম খাবারই খেয়েছি। সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া ব্যাঙের কাটলেট কিংবা সাপের মাংসের কষা ঝোল, এসব প্রাকৃত খাদ্যের বর্ণনা দিয়ে বিরক্তি সৃষ্টি করতে চাই না।

সুতরাং যা উচিত তাই করছি। দুয়েকটা গল্প করছি।

প্রথমে আমার এক বন্ধুর গল্প বলি। সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে দুপুর পর্যন্ত সে আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিত।

আমাদের সংসারের অলিখিত একটা নিয়ম আছে। দুপুর বা সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে যদি কেউ থেকে যায় তাকে খেয়ে যেতে বলা হয়। এটা আমার মায়ের নিয়ম ছিল। আমার স্ত্রীও পালন করেন।

এর পরে কখনও কখনও দু'য়েকজন লোককে খাওয়াতে হয় বটে কিন্তু সাধারণত সবাই কেটে পড়ে । তা, সবাই চলে গেলেও আমার সেই বন্ধু থেকে যেত। সে যে কতবার আমাদের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ও নৈশাহারে আমাদের সঙ্গী হয়েছে।

বন্ধুটি আমাকে বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে একদিন আমাকে জম্পেশ খাওয়াবে। আমার ধারণা ছিল কোন হোটেলে বা রেস্তরাঁয় খাওয়াবে কিন্তু সে লোভ দেখালো, একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোকে চর্বচোষ্য খাওয়াব।

সে এই রকম মাঝে মাঝে বলে বটে কিন্তু নিমন্ত্রণ আর করে না। এদিকে একদিন আমার ভীষণ দাঁত ব্যথা। সন্ধ্যাবেলা দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেছি। ডেন্টিস্টের চেম্বার যে গলিতে সেই গলিতেই আমার উদাসীন বন্ধুটির বাড়ি।

দাঁত তুলতে হতে পারে, কখনও কখনও ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক হয়, সেই জন্য দাঁত তোলার সময় সঙ্গে কেউ একজন থাকলে ভাল হয়।

সেই জন্য বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। তাঁকে সঙ্গে করে ডাক্তারের চেম্বারে এলাম। এবং সত্যিই সেদিন দাঁত তুলতে হয়েছিল। প্রচুর রক্তপাতও হয়েছিল, দাঁত তোলার পর অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলাম। মাড়ির যেখান থেকে দাঁত উপড়ানো হয়েছে সেখানে তুলো চেপে ধরে ডাক্তারবাবুর নির্দেশাবলী শুনলাম, আজ রাতে কিছুই খাবেন না, বড় জোর এক গেলাস দুধ। কাল সকালে নরম গলা ভাত, ঐ রকম তরকারি।

বন্ধুটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁতের ডাক্তারের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে বলল 'অনেক দিন পরে আমাদের এদিকে যখন এসেছিস, আজ তোকে না খাইয়ে ছাড়ব না।'

অবশ্য এর চেয়েও দুঃখজনক আরেকটা ঘটনা আমার জীবনে আরও ঘটেছে। আরেকটা উদাহরণ দিই। একদিন আমার অফিসের এক তরুণ আধিকারিক আমাকে বললেন, 'স্যার আজ রাতে আপনি আমাদের বাড়িতে খাবেন।' আমি তো মহানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।



সন্ধ্যাবেলা গাড়িতে করে ছেলেটির সঙ্গে তার বাড়িতে যেতে যেতে ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি যে দুম করে আমাকে খেতে নিয়ে যাচ্ছ বাড়িতে, তোমার স্ত্রী জানেন তো?'

আমার প্রশ্ন শুনে ছেলেটি বলল, 'জানে মানে, আপনাকে নেমন্তন্ন করা নিয়ে সকালবেলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার অবস্থা হয়েছিল। শেষে বহু কষ্টে রাজি করিয়েছি।'

এর পরে সেই নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করেছিলাম কিনা কেউ অনুগ্রহ করে জানতে চাইবেন না।

রং-বেরং



ভারতীয় পাসপোর্টে আজকাল নাম, বাবার নাম, জন্ম তারিখ ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি তথ্য ছাড়া আর প্রায় কিছুই উল্লেখ করা হয় না।

পুরনো পাসপোর্টের পৃষ্ঠা খুলে দেখছি সেখানে চোখের রং, চুলের রং, উচ্চতা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য শারীরিক চিহ্ন, এমনকি লেখাপড়া, চাকরি বা বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে সব রকম তথ্যই দেয়া আছে।

মার্কিনীরা অবশ্য এরও ওপরে আরেক কাঠি সরেস। তাদের ভিসার ফর্মে দেখেছি গাত্রবর্ণ কেমন সেটাও লিখতে হয়।

ভিসা ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে এই গাত্রবর্ণের জায়গায় আটকিয়ে গিয়েছিলাম।

আমার গায়ের রং কালো কিন্তু খুব কালো বলা চলে না। আমার স্বর্গতা জননী বলতেন, 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ', ঐ উজ্জ্বলতার মধ্যে অবশ্য স্নেহরস মিশ্রিত ছিল। তবে শ্যামবর্ণ বললে খুব ভুল হবে না।

কিন্তু ফর্ম পূরণের সময় শ্যামবর্ণের কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ কলমে এলো না। অথচ কৃষ্ণবর্ণ লিখতে পারছি না, প্রথমত আমি যথেষ্ট কালো নই বলে এবং দ্বিতীয়ত কৃষ্ণবর্ণ বা ইংরেজিতে ব্ল্যাক বললে যা বোঝায়, যে মানবগোষ্ঠীর লোক বোঝায় আমি তা নই।

আবার সেই অর্থে সাদা বা হোয়াইটও আমাকে বলা যাবে না, আমার রং ফর্সা হলেও বলা যেত না। কারণ শ্বেতাঙ্গ যাকে বলে আমি তা নই।

আমার ইতস্তত দোনোমনো ভাব দেখে অভিজ্ঞ ভিসা আধিকারিক আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, গাত্রবর্ণের পাশে লিখে দিলেন, হুইটিশ (Wheatish), মানে গমের মত রং।

পাশে বসে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন আমার স্ত্রী। তাঁর গায়ের রং সাধারণ বাঙালির তুলনায় মোটামুটি ফর্সা। নিজের ফর্ম পূরণ করার সময় তিনি তাঁর রমণী দুর্লভ বুদ্ধি খাটিয়ে গাত্রবর্ণের পাশে লিখলেন, 'লেন্টিলিশ'(Lentilish), অর্থাৎ জলের মত রং। প্রসঙ্গত স্মরণীয় আমেরিকায় 'পালস্'(Pulse) বলে না, বলে 'লেন্টিল'।

সে যা হোক, দূতাবাসের সদাতৎপর ভিসা আধিকারিক আমার স্ত্রীর হাত থেকে এই সময়ে ফর্মটা নিয়ে সেখানে 'লেন্টিলিশ' কেটে আবার 'হুইটিশ' লিখে দিলেন।

ধন্য! ধন্য!! মার্কিন গণতন্ত্রের অপার মহিমা। কলমের এক খোঁচায় আমার মলিন শ্যামবর্ণ এবং মাননীয়া গৃহিনীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দুইই হুইটিশ হয়ে গেল।

ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি, দেশ নিয়ে মানুষে মানুষে যত ফারাক তার চেয়ে অনেক বেশি ফারাক গায়ের রং নিয়ে। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, হরিৎ জগৎ জুড়ে কত রকমের মানুষ।

কবি যতই বলুন,

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু
সে জাতির নাম মানুষ জাতি......'

আল্লা, ঈশ্বর, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত এই বর্ণভেদ-এর হাত থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই।

উত্তর আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মিশ্রণে সংকর মানুষ তৈরি হচ্ছে,

তারা হল মুলাটো(Mullato), তাদের গায়ের রং ক্যাটকেটে ফর্সা বা কুচকুচে কালো নয়, তারাই যথার্থ 'হুইটিশ'।

আমরা এই উপমহাদেশীয়েরা সেদিক থেকে প্রাচীনতম মিশ্র মানব। বহু সভ্যতা, বহু ঐতিহ্য, বহু নরগোষ্ঠীর আমরা মিলিত উত্তরসূরী, কবির ভাষায়,

'হেথায় আর্য হেথা অনার্য....
..... শক, হুণ দল, পাঠান মোগল
এক দেহে হলো লীন।......'

আমার এবং আপনার রক্তের স্পন্দনে রয়েছে তাতার দস্যুর নিষ্ঠুরতা, পীতবালিকার দীর্ঘশ্বাস, এশিয়া মাইনরের ঝোড়ো বাতাস, আরব্য রজনীর রোমান্স, বেদ ব্রাহ্মণের মন্ত্রধ্বনি, আজানের আকুলতা। তারই প্রতিফলন রয়েছে আমাদের বিচিত্র ও বিবিধ গাত্রত্বকে। তাই আমরা রং-বেরং।

ঢাকাই রসিকতা



পা পিছলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেলে ঢাকার লোকেরা সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন করে, 'কি হইলো? দুঃখু পাইলেন নাকি?' এখানে দুঃখু মানে দুঃখ, আঘাত বা চোট।

এ প্রশ্ন অবশ্য সাধারণ সৌজন্যমূলক। সিঁড়ি দিয়ে পা পিছলিয়ে পড়ে আহত হওয়ার ক্ষেত্রে এর চেয়েও মারাত্মক অভিব্যক্তি আছে প্রাচীন ঢাকাই রসিকতায়, সেখানে ভূপতিত ব্যক্তিকে সহানুভূতি জানানো হচ্ছে এই বলে যে, 'সাহেব দুঃখু পাইছেন ঠিকই, কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামছেনও খুব তাড়াতাড়ি।'

এ সব পুরনো রসিকতা। এর অধিকাংশ ঢাকাই কুট্টিদের নামে চালু আছে, কিছু ঢাকা শহরের আদি বাসিন্দাদের নামে।

এ বছর শীতশেষে, গত ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা গিয়েছিলাম। ঢাকা আমার তীর্থস্থান। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে অন্যান্যের মধ্যে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গঙ্গাসাগর তীর্থ। পাঠক-পাঠিকা স্মরণ করুন রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস', 'আয় তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।' সেই গঙ্গাসাগর, যেখানে শ্বাপদ সঙ্কুল গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে গঙ্গার স্রোতধারা সমুদ্রে পড়েছে একদা নিতান্ত অগম্য ছিলো। সেই সময়ে বাঙালি হিন্দুর ঘরে প্রচলিত প্রবচন ছিলো,

সব তীর্থ বারবার।
গঙ্গাসাগর একবার।।

একালের আমাদের মানে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবাসী প্রাক্তন পূর্ববঙ্গীয়দের তীর্থ হল ঢাকা। কিন্তু এ ঢাকা গঙ্গাসাগরের মত অগম্য নয়। আমার জানাশোনা আপনজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান অসংখ্য এ পারের মানুষের কাছে তীর্থ বিষয়ক শেষতম প্রবচনটি হল,

সব তীর্থ একবার
বুড়িগঙ্গা বারবার।।

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবিতা পরিষদ জাতীয় কবিতা উৎসবে যোগদানের জন্য। শুধু আমন্ত্রণ নয় তার সঙ্গে যাতায়াত এবং আতিথেয়তা। আর সে আতিথেয়তার তুলনা জগৎসংসারে আর কোথাও পাওয়া যাবে না একমাত্র বেদুইনদের কল্পকাহিনী ছাড়া।

কিন্তু এর মধ্যে রসিকতা কোথায়?

আমি তো হাল আমলের ঢাকাই রসিকতা নিয়ে লিখতে বসেছি।

প্রত্যেকবার যেমন হয়, এবারও বইপত্র পেয়েছি প্রচুর। কিন্তু তার সবই তো

সরল বা জটিল কবিতা কিংবা গুরুগম্ভীর গদ্য। এর মধ্যে হাসির উপাদান আমার মত লোকের পক্ষেও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

সুতরাং বইয়ের কথার চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথায় যাই। এটা একেবারে শেষদিনের অভিজ্ঞতা।

ঢাকা বিমান বন্দরে কলকাতায় ফিরে আসার জন্যে বিমানের উড়ানের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার পাশেই বসেছিলেন এক স্বচ্ছল দম্পতি সঙ্গে তাদের কিশোরী কন্যা। কন্যাটিকে তাঁরা শান্তিনিকেতনে ভর্তি করতে নিয়ে যাচ্ছেন।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে জনক-জননী কন্যার বুদ্ধিমত্তার টেষ্ট নিয়ে যাচ্ছেন। মেয়েটি সাধ্যমত উত্তর দিচ্ছে।

একটি প্রশ্নোত্তর স্মরণীয় : —

বাবা ঃ রাতের বেলা সূর্য কোথায় যায়?

মেয়ে ঃ কোথায় আর যাবে যেখানে আছে সেখানেই থাকে।

মা ঃ তা হলে দেখা যায় না কেন?

মেয়ে ঃ দেখা যাবে কি করে। অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়?

এর পর ঢাকার হোটেলের একটি কথোপকথন স্মরণ করছি : —

খদ্দের ঃ ঘর আছে?

ম্যানেজার ঃ আছে।

খদ্দের ঃ খাবার?

ম্যানেজার ঃ আছে।

খদ্দের ঃ বাথরুমে জল?

ম্যানেজার ঃ আছে।

খদ্দের ঃ মশা?

ম্যানেজার ঃ আছে।

জাহাজ

আমরা জলের দেশের লোক। আমাদের ছোট শহরের চারপাশে নদী-নালা, খাল-বিল। জল আর জল। কাছেই দুদিকে একটু এগিয়ে পিছিয়ে দুটো স্টিমার

ঘাট, চারাবাড়ি আর পোড়াবাড়ি।

সামনে দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরী নদী দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এলাসিন, স্টিমারের জংশন স্টেশন। চারাবাড়ি পোড়াবাড়িতে স্টিমার আসে সিরাজগঞ্জ থেকে আর এলাসিনে সিরাজগঞ্জের স্টিমার ছাড়াও ঢাকার স্টিমার আসে, যায়।

এলাসিন আমার গ্রাম, আমার জন্মভূমি। এখনো সেখানে গৃহদেবতা আছেন, ভদ্রাসন আছে।

আমাদের এই জলভূমিতে রেলগাড়ি পৌঁছায়নি। শেষতম রেলপথ ছিল পঞ্চাশ মাইল দূরে। একটা নড়বড়ে বাসরাস্তা ছিল জেলা সদর পর্যন্ত কিন্তু সে পথও বর্ষাবাদলে খুব সচল থাকতো না।

যাতায়াতের জন্য আমাদের প্রধান ভরসা ছিল জলপথ, নৌকো ও স্টিমার।

আমাদের অঞ্চলে স্টিমারকে বলা হতো জাহাজ। প্রাচীন গ্রামবৃদ্ধেরা কেউ কেউ বলতেন কলের নৌকো বা কলের জাহাজ।

জাহাজ বাংলা শব্দ নয়। মূল আরবি শব্দটি হলো জহাজ। বহুকাল আগে আরব সাগর বেয়ে এই শব্দটি বঙ্গোপসাগরে ভেসে এসেছে।

জাহাজ প্যাটার্ন বাড়ি, জাহাজ মার্কা বিড়ি। জাহাজ বাঙালির খুব নিজের শব্দ হয়ে গেছে। সংস্কৃত অর্ণবপোষ টেঁকেনি। এমনকি বাংলা প্রবাদে ঢুকে এই আরবি শব্দটি বুদ্ধির জাহাজ হয়ে গেছে।

সে যা হোক, জাহাজের দিন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। মালবাহী জাহাজ এখনো আছে, যাত্রীবাহী জাহাজ বিরল। তার জায়গা নিয়েছে উড়োজাহাজ।

কলকাতা বন্দর থেকে একদা দেশ-দেশান্তরে যাত্রীবাহী জাহাজ যেতো। এখন শুধুই কালেভদ্রে আন্দামান যাওয়ার জাহাজ ছাড়ে।

জাহাজ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্পকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী আছে। মনসামঙ্গল থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে অন্নদাশংকর রায় পর্যন্ত সে কাহিনীর বিস্তার।

জাহাজযুগের অবসানে একটা পুরনো দিনের কাহিনী স্মরণ করি।

বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) বন্দর থেকে শেষ বিলেতগামী জাহাজ ছেড়েছিলো ষাটের দশকের গোড়ায়। সেই জাহাজে কলকাতার তখনকার প্রবীণ ব্যবহারজীবী ব্যরিস্টারি পড়তে লণ্ডন গিয়েছিলেন। বর্তমান গল্পটি তিনিই আমাকে বলেছিলেন। গল্পের খাতিরে ব্যরিস্টার সাহেবকে মিঃ চৌধুরী বলে অভিহিত করছি।

জাহাজের ডাইনিং হলে প্রথম দিন রাতে ডিনারের সময়ে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে

এক ফরাসী সাহেবের পরিচয় হয়। নিতান্ত মুখ পরিচয়, কারণ মিঃ চৌধুরী ফরাসী ভাষা জানেন না। ওদিকে ফরাসী সাহেবও ইংরেজিতে সড়গড় নন, বিশেষ বলার চেষ্টাও করেন না।

ফরাসী সাহেব ডাইনিং টেবিলে ফরাসী কেতায় অভিনন্দন জানালেন, 'Bon Appetit'। মিঃ চৌধুরী ভাবলেন ভদ্রলোক নিজের নাম বলে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন, সেটাই স্বাভাবিক।



সুতরাং বিনিময়ে তিনিও বললেন, 'এইচ.এস.চৌধুরী।' কিন্তু মনে খটকা রয়ে গেলো।

এই রকম বেশ কয়েকদিন চললো। এর মধ্যে মিঃ চৌধুরীর জাহাজেই এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো যিনি ভালো ফরাসী জানেন। তাঁকে মিঃ চৌধুরী নিজের সমস্যাটা বললেন।

ভদ্রলোক মিঃ চৌধুরীকে বললেন, 'Bon Appetit' ভদ্রলোকের নাম নয়। 'Bon Voyage' যেমন 'যাত্রা মধুর হোক', তেমনি 'Bon Appetit' একটা শুভেচ্ছা, 'আহার মধুর হোক।'

এর পরের ঘটনা অবশ্য অতীব হাস্যকর। এই জ্ঞান লাভ করার পরে ডাইনিং টেবিলে সেই ফরাসী সাহেবকে তাঁরই কেতায় মিঃ চৌধুরী শুভেচ্ছা জানালেন,

'Bon Appetit'।

এই শুনে ফরাসী ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এইচ.এস.চৌধুরী।' কারণ এতদিনে ঐ ভদ্রলোক ধরে নিয়েছেন এইচ.এস.চৌধুরী হলো কোনো ভারতীয় ভাষায় শুভেচ্ছা, ভোজন শুভেচ্ছা।

পুনশ্চ ঃ

জাহাজ কাহিনীর শেষে একটা জাহাজডুবির গল্প।

জাহাজ নিয়ে যত গল্প জাহাজডুবি নিয়ে গল্পের সংখ্যাও তার চেয়ে কম নয়। জাহাজডুবি নিয়ে, বিশেষত ইংরেজি তথা ইউরোপীয় ভাষায় রচিত রোমাঞ্চকর স্মরণীয় কাহিনীর সংখ্যা অনেক।

এ গল্পটা অবশ্য রোমাঞ্চকর নয় বরং বলা চলে নীতিমূলক।

জাহাজডুবির পর সমুদ্র সাঁতরিয়ে এক নাবিক এক নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোথাও মানুষজন, জনপদ, সভ্যতার চিহ্ন কিছু নেই।

এই শূন্য দ্বীপে নাবিকটির মাস কয়েক কাটলো। হঠাৎ একদিন একটা জাহাজ দেখা গেলো। নাবিকটি উল্লসিত হয়ে দৌড়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে নিজের জামা খুলে একটা গাছের ডালের মাথায় পতাকার মত উড়িয়ে জাহাজটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

জাহাজটি তীরে এসে দাঁড়াতে ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন ডেকে এসে দাঁড়িয়ে নাবিকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এখানে কতদিন আছেন?'

নাবিকটি বলল, 'মাস কয়েক হবে।'

ডেক থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভালোই তো আছেন মনে হচ্ছে।'

নাবিকটি চুপ করে রইলো।

ক্যাপ্টেন বললেন 'আমি জাহাজ থেকে গত ছয় মাসের কিছু কিছু খবরের কাগজ আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি। পড়ে দেখুন, তারপরে বলুন পৃথিবীতে ফিরতে ইচ্ছে করে কি না।'

এই গল্পটা এই পর্যন্তই জানি। এর পরে ঠিক কি হয়েছিলো বলতে পারবো না।

অপরাধ

অপরাধ যে কত বিচিত্র রকমের হয়। যদিও জানি অপরাধ ঠিক রসিকতার বিষয় নয়। তবু দুয়েকটা ঘটনা এমন ঘটে যা হাসির গল্পকেও হার মানায়।

কিছুকাল আগে আহমেদাবাদ, গুজরাটের গান্ধী আশ্রম থেকে এক ব্যক্তি সেখানকার যাদুঘর থেকে কিছু জিনিস চুরি করে।

সেই গান্ধী মিউজিয়ামে মহাত্মা গান্ধীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তো ছিলই সেই সঙ্গে তাঁর কয়েকটি খসে পড়া দাঁত ছিলো। বুদ্ধিমান তস্করটি সেগুলিও অপহরণ করে।

তস্করটি বুঝেছিলো দেশ-বিদেশে গান্ধীপ্রেমীদের কাছে মহাত্মার এই স্খলিত দাঁতগুলির মূল্য অপরিসীম। গোপনে ধনবান গান্ধীভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তস্করটি এই দাঁত বহুমূল্যে বিক্রি করতে থাকে।

বলা বাহুল্য, খবরটা চাপা থাকেনি। এবং অবশেষে পুলিশের কাছে এই বার্তা পৌঁছায়। পুলিশ জাল বিছোয় এবং একদিন এক ধনকুবেরের কাছে বহুমূল্যে একটি দাঁত বিক্রির সময় গোয়েন্দাপুলিশ এই চোরটিকে হাতে নাতে ধরে ফেলে।

এ পর্যন্ত তবু ঠিক আছে। কিন্তু এর পরের ঘটনা মারাত্মক।

তস্করটির আস্তানা খানাতল্লাস করে একটি গুজরাটি বটুয়া বেরোলো, যেটি মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং ব্যবহার করতেন, এটিও সেই গান্ধী মিউজিয়াম থেকে চুরি। ঝোলাটির গায়ে গুজরাটি ভাষায় কাগজের লেবেল লাগানো, সেই লেবেলে লেখা,

'মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দাঁত।'

সর্বোপরি চমক হলো, বটুয়াটির মধ্যে অনেক দাঁত। পুলিশের লোকেরা গুনে বার করলো, দাঁতের সংখ্যা একশো চুয়ান্ন।

সত্যি, এতগুলো দাঁত মহাত্মা গান্ধীর? পরস্পর অবগত আছি, সামনের মাসে আমেরিকাব ফ্লোরিডা শহরে আন্তর্জাতিক দন্ত চিকিৎসক মহাসমাবেশে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

আলোচনার ফলাফল যাই হোক, আমি আমার গ্রাম্য, বাঙাল বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে বলতে পারি যে আহমেদাবাদের গান্ধী মিউজিয়ামের চোর, শুধুই চোর নয় সে জোচ্চরও বটে।

সব অপরাধী যে এমন চোর-জোচ্চর হয় তা নয়। অনেক ভালো ক্রিমিন্যালও থাকে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

বছর দশ-পনেরো আগের কথা। তখন আমি সদ্য সাধারণ মোটা থেকে অসাধারণত্বের দিকে এগোচ্ছি।



সেটা আবার চোঙা প্যান্টের যুগ। আমি নিজে ফ্যালন পোশাকের অনুগ্রাহক নই। কিন্তু দরজিরা ছাড়বে কেন? তারা একটা চাপা প্যান্ট বানিয়ে দিয়েছে। এদিকে তখন আমি একেবারে কবির ভাষায়, 'দিনে-দিনে বাড়ে কালকেতু'। দিন দিন মোটা হচ্ছি, মোটা হয়ে যাচ্ছি, বর্তমানের পরিণতির দিকে দ্রুত এগোচ্ছি।

সে যা হোক, ঐ রকম প্যান্ট পরে একদিন একটা মিনিবাসে উঠেছি। ওঠার সময় খালি ছিল বাসটা, মাত্র দু-চারজন দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু একটু পরেই বেশ ভিড় হলো।

এবং একটু বাদে খানিকটা জোর করে চাপানো ধাক্কাধাক্কির পর টের পেলাম আমার অতিরিক্ত চেনা প্যান্টের সংকীর্ণ পকেটে কে যেন হাত ঢুকিয়েছে।

আমি বাসের ওপরের রডটা ধরে ইচ্ছে করে সামনের দিকে ঝুঁকে একটু কাত হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে 'মরে গেলাম রে' বলে আর্তনাদ। অনুপ্রবেশকারীর হাতের কবজিটা মুচকিয়ে গেছে এবং সে ছটফট করছে তার হাতটিকে প্যান্টের পকেট থেকে বের করার জন্য কিন্তু সেটি সম্ভব নয়।

পকেটমারটি নব যুবক, ভদ্র চেহারার। এ কাজে হয়তো তার সদ্য হাতেখড়ি হয়েছে। সে কোঁকাতে কোঁকাতে আমাকে নিচুগলায় অনুরোধ করলো, 'দাদা, ছেড়ে দিন।'

আমি বললাম, 'আমি কি তোমাকে আটকিয়েছি যে ছাড়বো?'

পকেটমার বললো, 'আপনি একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান। তা হলে আপনার প্যান্টের পকেটের ভেতর থেকে আমার হাতটা বের করার চেষ্টা করি। মারা পড়েছি। কবজিটা একদম উলটিয়ে গেছে দাদা।'

আমি তবুও সোজা হলাম না। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি আমার পকেটে হাত দিতে গেলে কেন?'

সে বললো, 'ভিড়ের মধ্যে খুব ঘেমে গিয়েছিলাম। ভাবলাম আপনার পকেটে যদি পরিষ্কার রুমাল থাকে।'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে যা উত্তর দিলো তারপরে আর কিছু বলার থাকতে পারে না। করুণ কণ্ঠে সে বললো, 'মা বলে দিয়েছে, রাস্তাঘাটে কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যাবে না।'

গুলি

প্রথমেই কবুল করি, এ গুলি সে গুলি নয়। চণ্ডুর গুলির কথা হচ্ছে।

চণ্ডুর গুলি কি জিনিস আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না। কিন্তু সংসদ বাংলা

অভিধানে দেখছি, গুলিখোর মানে চণ্ডুখোর। গুলি আসলে নেশার জিনিস। আফিং তথা ভাং তথা চণ্ডুর ছোট সাইজের নাড়ু।

মদ, তারি, ওয়াইন, বিয়ার এইসব হল তরল নেশার জিনিস, পাত্রে ধরে পান করতে হয়। গাঁজা, তামাক হল ধোঁয়াটে নেশা। আর সলিড বা কঠিন নেশা হল চণ্ডু বা গুলি। চরস, ভাং বা সিদ্ধি দিয়ে তৈরি।

এই ভাবে পদার্থ বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের যাবতীয় নেশার জিনিসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। কঠিন, তরল এবং বায়বীয়।

অবশ্য এই ড্রাগের যুগে গাঁজা, ভাং, সিদ্ধি দুর্লভ হয়ে পড়েছে। বহু দেশেই এই সব নেশার দ্রব্য এখন বেআইনি।

ড্রাগও বেআইনি। পৃথিবীর বহু দেশেই ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরা পড়লে চরম দণ্ড পেতে হয়। কিন্তু তবু এই বহু মূল্য প্রাণঘাতী নেশার জিনিসের চাহিদা ও যোগান সারা পৃথিবীতেই বিস্তৃত। আধুনিক পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি টাকার ব্যবসা, এমন কি অস্ত্র ব্যবসার চেয়েও মহার্ঘ ব্যবসা হল ড্রাগ নিয়ে।

একদা এই আমাদের বাল্যকালেই গ্রামে শহরে, পাড়ায় পাড়ায় গেঁজেল ও গুলিখোরদের দেখা মিলতো। তারা অধিকাংশই ছিল প্রবীণ। আমি অল্প বয়সে এমনকি বৃদ্ধা মহিলাদের আফিংয়ের গুলি খেতে দেখেছি। আজকাল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত, নবযুবক-নবযুবতীরা উঠতি বয়সে জীবনের অবলম্বন হারিয়ে ড্রাগের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে।

আলোচনা খারাপ দিকে চলে যাচ্ছে। আমার পাঠক পাঠিকারা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ার আগে গুলির গল্পে যাই।

গুলির গল্প মানে গুলিখোরের গল্প। এই সব গুলিখোরেরা এখন আর কোথাও নেই, পৃথিবী থেকে তারা চিরতরে হারিয়ে গেছে।

গুলিখোরেরা আধা বাস্তব, আধা কল্পনার পৃথিবীর লোক। তারা তির্যক বুদ্ধির অধিকারী।

গুলিখোরদের বিষয়ে প্রথম গল্পেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

দুই গুলিখোর একটা নতুন জায়গায় এসেছে। জায়গাটা তাদের কাছে একেবারেই অচেনা। পথ ঘাট কিছুই চেনে না, কোন লোকজনের সঙ্গেও জানাশোনা নেই। এদিকে দুজনারই গুলির নেশা চরচরিয়ে উঠেছে। অবশিষ্ট গুলি যা সঙ্গে ছিল সেটাও খরচ হয়ে গেছে।

ইচ্ছে করলেই দোকান-বাজারে গুলি কেনা যাবে না। প্রত্যেক এলাকাতেই গুলির আড্ডা আছে, শুধুমাত্র সেই গোপন আড্ডাতেই গুলি পাওয়া সম্ভব।

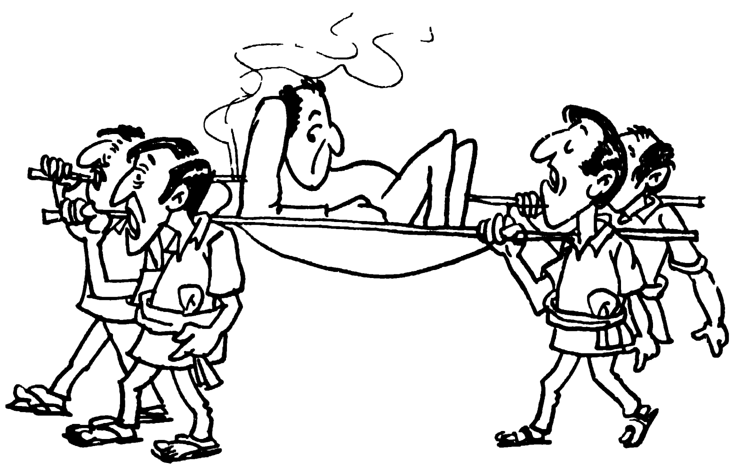
কিন্তু সেই গোপন আড্ডার সন্ধান পাওয়া যাবে কি ভাবে? দুজন পরদেশী মানুষ সেই আড্ডায় কি ভাবে পৌঁছাবে?

এই দুই গুলিখোর লোকজন যাতায়াত করছে এমন এক গলির মুখে দুজনে দুদিকে দাঁড়ালো। তারপর হাতেব তালু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুজনে দুপ্রান্ত থেকে একটা অদৃশ্য দড়ি পাকানোর অভিনয় করতে লাগল।

রাস্তার লোকেরা কেউ লক্ষ্য করল, কেউ লক্ষ্য করল না। যারা লক্ষ্য কবল তারা ধরে নিল, দুটো নতুন পাগল এসেছে এলাকায়। কিন্তু এরই মধ্যে একজন হঠাৎ কাল্পনিক দড়িটার ঠিক সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো, তারপর দড়ি পাকানোয় ব্যস্ত অচেনা লোক দুজনকে বলল, 'দাদারা দড়িটা একটু তুলুন, যেতে পারছি না যে।'

সঙ্গে সঙ্গে নবাগত গুলিখোরদ্বয় অনুরোধকারীর ওপবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'আপনার জন্যেই দড়ি পাকাচ্ছিলাম দাদা, আপনাদের আড্ডাটা কোথায় বলুন। নেশা না করতে পেরে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

গুলিখোরদের সম্পর্কে অন্য গল্পটি অনবদ্য।



এ গল্প পাঁচ গুলিখোরের। জমজমাট গুলির আড্ডায় হঠাৎ একজন ঘোষণা করল, 'আমি মরে গেছি। আমি আর বেঁচে নেই। আমি একজন মড়া।'

বলা বাহুল্য এরপর বাকি চারজনের ওপরে গিয়ে পড়ল গুরু দায়িত্ব। বন্ধুর মৃতদেহ তাদের সৎকার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়া জোগাড় হল। দস্তুর মত হিন্দু মতে খই ছড়াতে ছড়াতে, হরিনাম করতে করতে চার শববাহক পঞ্চম জীবিত বন্ধুর দেহ মৃতদেহের মত খাটিয়ায় তুলে শ্মশানের দিকে রওনা হল।

কিন্তু নেশার ঘোরে তারা ভুল পথে ঘুরতে লাগল। শ্মশানের পথ আর তারা খুঁজে পায় না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে তারা খাটিয়া ফুটপাথে নামিয়ে জিরোতে বসল।

এবার পঞ্চম ব্যক্তি মানে মড়া খাটিয়ায় উঠে বসল। তারপর শববাহকদের বলল, 'হায় রে, কালীমিত্র ঘাটের শ্মশান, নিমতলার শ্মশান, কেওরাতলার শ্মশান সবই চিনি। কিন্তু আমি যে মড়া, তাই কিছু বলতে পারছি না।'

নকল

নকল শব্দটি বাংলায় আরবি ভাষা থেকে এসেছে। আসলের বিপরীত হল নকল। বাংলা ভাষায় নকল শব্দের অনেক রকম ব্যবহার। নকলের অর্থ হল অনুকরণ, প্রতিলিপি। রাজশেখর বসু উদাহরণ দিয়েছেন, দলিলের নকল, নক্সার নকল।

কিন্তু আরো মানে আছে, পরীক্ষার খাতায় ছেলেরা নকল করে, সাদা বাংলায় যাকে বলে টুকলিফাই বা টোকা। টাইপিস্ট চিঠি নকল করেন। তারই পূর্বসূরী নকলনবিস মানে প্রতিলিপিকারক, ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকের সেই মাছি-মারা কেরানি।

দপ্তরের সেই বাঙালি বাবুরা ইংরেজী জানতেন না, ইংরেজী ভাষায় লেখা দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র তাঁরা যেমন দেখতেন, তেমন নকল করতেন। কোন কাগজে মাছি মেরে চেপটে থাকত, তবে নকল করার সময় তাঁরা সেই মরা মাছির ছবিটাও এঁকে ফেলতেন।

নকল করা আবার অনুকরণ করাও বটে। পাড়ার রকের উঠতি ছোকরা বোম্বাই সিনেমার নায়ককে নকল করে, সেই নায়কের মত চুল রাখে, ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে কথা বলে।

আবার সুন্দরীরা নকল মুক্তোর গয়না পরে। এক্ষেত্রে যেমন, নকল সোনার

ক্ষেত্রেও মানে যাকে গিল্টিকরা সোনা বলে, ব্যবহারকারীরা জানে যে, জিনিসটা নকল। কিন্তু দোকানদার যখন কোন নকল প্রসাধনদ্রব্য বা অন্য কিছু বিক্রি করে সেটা হল জাল। উভয় ব্যাপারটা কৃত্রিম, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী বুঝেই কেনেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জিনিসটা জোচ্চুরির পর্যায়ে পড়ে।

জাল-জোচ্চুরির কথায় যাচ্ছি না, নকল করা যাকে কপি করা বলে সেই বিষয়ে বলি।

সরকারী অফিস থেকে যদি চিঠি আসে দেখা যায় যে, সেই চিঠি শুধু একজনকে লেখা হয়নি, একজনকে উদ্দেশ করে লিখে বাকি সকলকে, সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি বা নকল দেওয়া হয়েছে। চিঠির নিচে লেখা আছে অমুক অমুককে নকল দেওয়া হল।

চিঠির যেমন, তেমনি অন্যান্য কাগজপত্রের, দলিলের, নথির নকল প্রয়োজন পড়ে। আগে হতো হাতে লিখে, তারপর টাইপ করে, খুব বেশি সংখ্যায় প্রয়োজন হলে সাইক্লোস্টাইল করে। এখন তো ফটোকপির যুগ চলছে, শহরে তো বটেই, গ্রামে-গঞ্জে, বাজারের, আদালতের রাস্তায় জেরক্স মেশিন, মুহূর্তের মধ্যে অবিকল প্রতিলিপি পাওয়া যাচ্ছে।

ফটোকপির কথাই বলি।

ছোট শহরের এক পুরনো শাখা অফিস থেকে অফিসের নব নিযুক্ত কর্তা হেড অফিসের বড় সাহেবকে জানিয়েছিলেন, 'এ অফিসে এসে দেখছি পুরনো কাগজপত্রে ঠাসা হয়ে আছে, নতুন কাগজপত্র রাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। যদি অনুমতি পাই, পুরনো কাগজগুলো সব ফেলে দিই, তা হলে স্থানাভাব অনেকটাই দূর হবে।' অবিলম্বে বড় সাহেবের উত্তর এল হেড অফিস থেকে,

"তোমার প্রস্তাবে আপত্তি নেই। পুরনো কাগজ ফেলে দিতে পার কিন্তু তার আগেই সমস্ত কাগজের অন্তত একটা করে ফটোকপি করে রেখে দেবে।"

বলা বাহুল্য এ গল্প অবশ্যই কোন অতি অনিচ্ছায় মফস্বলে বদলি-হওয়া অধঃস্তন কোন কর্মচারীর রটনা। ওপরওয়ালারা বিশেষ করে হেড অফিসের বড় সাহেবরা কি রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্বোধ হন, এই রটনায় তারই উদাহরণ রয়েছে। তবে নিতান্ত উদাহরণের কথা নয়। বড়ো সাহেবরা প্রায়শই অনেক রকম মজার ভুল করে থাকেন। এরকম একটি মজার ভুলের উৎস হল ঐ প্রতিলিপি বিষয়ক কেলেঙ্কারি। এক সভায় এক বড়ো সাহেবের পনেরো মিনিট বক্তৃতা করার কথা ছিল। যেমন হয় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সহায়ক অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তাঁর জন্যে ঠিক পনেরো মিনিটের একটা বক্তৃতা রচনা করে দেন। একেবারে ঠিকঠাক পনেরো মিনিট, একটুও কম-বেশি

যেন না হয়।

ব্যক্তিগত সহায়ক ভদ্রলোক অনেক যত্ন করে অনেক হিসাব, মাপজোক করে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পনেরো মিনিটের একটি বক্তৃতা রচনা করে বড়ো সাহেবকে দিলেন। যথাকালে বক্তৃতাসভায় বড়ো সাহেব সেই বক্তৃতা পাঠ করতে উঠলেন।



কিন্তু এ কি কাণ্ড? বড়ো সাহেব পড়া আরম্ভ করে দেখেন পনেরো মিনিট কেন, বিশ মিনিট-পঁচিশ মিনিটেও কুলোল না, ঠিক পাকাপাকি আধ ঘণ্টা, পুরো তিরিশ মিনিট লাগল বক্তৃতা শেষ হতে।

বড়ো সাহেব তো রেগে কাঁই। ব্যক্তিগত সহায়ক এত দায়িত্বহীন এভাবে তাঁকে ডোবাল।

সেই সহায়ক ভদ্রলোকও সেই সভাতে ছিলেন। বড়ো সাহেব বক্তৃতার পরেই মঞ্চের আড়ালে ডেকে নিয়েই তাকে খুব ধমকালেন, "আপনাকে বললাম পনেরো মিনিটের বক্তৃতা লিখে দিতে, আপনি বললেন, পনেরো মিনিটের বক্তৃতাই লিখেছেন, অথচ এখন পড়তে গিয়ে আধঘণ্টা লাগল। আপনার মত অযোগ্য লোক আর আমি জীবনেও দেখিনি।"

এরকম কথা শুনে প্রাইভেট সেক্রেটারির মাথা গরম হয়ে গেল, তিনি সরাসরি

বলে বসলেন, "না স্যার, আমার কোন ভুল হয়নি, ভুল হয়েছে আপনার।"

"আমার ভুল হয়েছে?" বড়ো সাহেব গর্জে উঠলেন, "কি ভুল হয়েছে আমার?" প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন, " আপনার বক্তৃতাটা যে আমি টাইপ করে দিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে একটা কার্বন কপি ছিল। আপনি মূল বক্তৃতাটার পর আবার সেই কার্বন কপিটাও পড়েছেন। দেখলেন না, হলের ভিতর শ্রোতারা কেমন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল শেষের দিকে, সভার সভাপতি পর্যন্ত অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকিয়েছিলেন।"

পুনশ্চ ঃ

পুনশ্চে ঐ একই রকম গল্প। আগে কথা ছিল যে শয়তান লোকের যদি কোন কাজ না থাকে তো তাকে কুকুরের লেজ সোজা করার কাজে লাগিয়ে দাও, সে কাজ কখনই সমাধা করতে পারবে না। সদাব্যস্ত থাকবে, অন্য কাউকে বিরক্ত বা কারোর ক্ষতি করতে যাবে না। এখন বলা হচ্ছে যে, ওপরওয়ালা যদি বদমাস হয় তাকে সদাব্যস্ত রাখতে হবে। এবং তার একমাত্র উপায় হল তার হাতেই দুই-পৃষ্ঠা টাইপ করা একটা কাগজ ধরিয়ে দিতে হবে সকালে অফিসে আসামাত্র। কাগজটির দু'পিঠেই নিচে লেখা থাকবে P.T.O মানে পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ওপরওয়ালা সারাদিন ধরেই সেই কাগজ উল্টেপাল্টে পড়ে যাবে, অন্য কোন দিকে, কারো দিকে মন দিতে পারবে না।

অবুঝ

চলন্তিকার ভাষায়, 'যাহাকে বোঝানো যায় না।' 'অবুঝ' কথাটার মানে খুব স্পষ্ট, যে বুঝতে পারে না বা চায় না। যেমন ছোটছেলে অবুঝ হয়, জ্বর গায়ে খেলতে যাবে বলে মায়ের কাছে বায়না ধরে। যেমন অবুঝ মাতাল চূড়ান্ত নেশা করার পরেও আরও মদ গেলে, গিলে বমি করে, অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা কিন্তু এই নিবন্ধে 'অবুঝ' শব্দের এই প্রচলিত মানে নিয়ে এগোচ্ছি না। বুঝতে না পেরে বা ভুল বুঝে অবুঝের মতো কাজ করে ফেলা দুয়েকটা ব্যাপার নিয়ে এই নিবন্ধ।

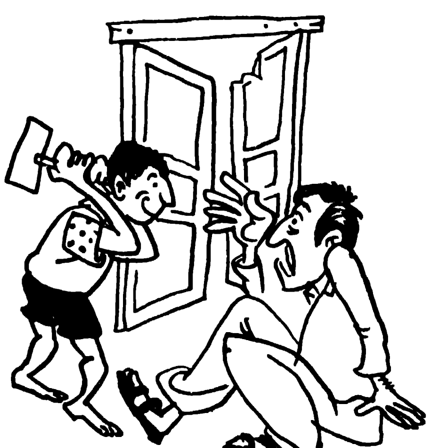
প্রথমে একটা সহজ উদাহরণ নেয়া যাক। খগেনবাবুর বাড়ির একটা দরজা একটু ভেঙে গেছে। খগেনবাবু নিজের কাজ নিজে করতে ভালবাসেন। তা

ছাড়া আজকাল ছুতোর মিস্ত্রির যা খরচা।

সুতরাং এক রবিবার সকালে খগেনবাবু কয়েকটা পেরেক বাজার থেকে কিনে আনলেন এবং তারপরে রান্নাঘর থেকে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা নিয়ে এসে দরজাটা নিজেই সারাতে বসলেন।

সমস্যাটা কিছুক্ষণ বুঝে নিয়ে তিনি তাঁর ছেলে নগেনকে ডাকলেন তাঁর সাহায্যের জন্য। খগেনবাবুর ছেলে নগেনের বয়স এগারো, তাকে খগেনবাবু বুঝিয়ে বললেন যে, 'এই দরজাটা আমি ঠেলে ধরব একহাত দিয়ে আর অন্য হাত দিয়ে চৌকাঠের গায়ে এই পেরেকটা ধরব। তুমি ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখো, আমি যেই মাথা নাড়ব তুমি হাতুড়ি দিয়ে জোরে মারবে।'

যেমন কথা তেমন কাজ। খগেনবাবু শক্ত করে পাল্লাটা ধরে পেরেকটা যথাস্থানে আরোপ করে মাথা নেড়ে হাতুড়ি মারতে সঙ্কেত জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র হস্তে বয়সের তুলনায় একটু বেশি শক্তিশালী, একটু বেশি বলবান নগেন সজোরে হাতুড়ি মারল খগেনবাবুর মাথায়। খগেনবাবুর নির্দেশ নগেনের মোটেই হৃদয়ঙ্গম হয়নি। আর তাছাড়া তার এই সহজ বুদ্ধিরও অভাব যে বিবেচনা করে দেখবে, বাবা কেন তার নিজের মাথায় হাতুড়ি মারতে বলবে।



সে যা হোক, পরবর্তী ঘটনা অতিশয় শঙ্কাজনক। খগেনবাবু চোখ উলটিয়ে

অজ্ঞান হয়ে যান। চার বালতি জল ঢালার পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। চোদ্দদিন অফিসে ছুটি নিয়েছেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। সর্বদাই মাথা ঝিমঝিম করে।

আর সেই ভাঙা দরজাটা সেই একই অবস্থায় রয়েছে।

এরপরের ঘটনাটা বিদেশী। এক বড় দোকান যাকে বলে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, সেই দোকানের ঘটনা।

দোকানের ম্যানেজার সাহেব সব সময় সব কাউন্টারের দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখেন ঠিকমতো বেচাকেনা হচ্ছে কি না, সেলসম্যানরা ঠিকমতো কাজ করছে কি না।

বিশাল হলঘরের ভিতরে ছড়ানো-ছিটানো দোকানের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। হলের ঠিক মাঝখানে টেবিল নিয়ে ম্যানেজার সাহেব বসেন। পুরনো দোকান, অধিকাংশই বাঁধা খদ্দের, তাদের অনেককেই ম্যানেজার সাহেব চেনেন, অন্তত মুখচেনা আছে।

সেদিন ম্যানেজার সাহেব যথারীতি তাঁর যথাস্থানে বসে তদারকি চালাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর নজরে পড়ল অদূরবর্তী একটি কাউন্টারে এক অচেনা খদ্দের কি যেন বলছেন আর সেলসম্যান 'না, হবে না, অনেকদিন নেই' এই সব বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

এই সেলসম্যানটি নতুন। ম্যানেজার সাহেবের একে মোটেই পছন্দ নয়। তিনি ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছেন, এই সেলসম্যানটি অনেক সময়েই দ্রব্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও খদ্দেরকে 'না নেই' বলে ফিরিয়ে দেয়।

আজকে সেলসম্যানটি ম্যানেজার সাহেবের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলো। তিনি নিজের টেবিল থেকে উঠে সংশ্লিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে সেই অচেনা খদ্দেরকে বললেন, 'আমাদের এখানে এসব আছে। সব পাওয়া যাবে, আপনি কি চাইছেন বলুন?' তারপর সেলসম্যানকে বললেন, 'তুমি এই চাকরি বেশিদিন রাখতে পারবে না। সব খদ্দেরকে তুমি নেই, অনেকদিন নেই, হবে না এই সব বলে ফিরিয়ে দাও।'

ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনে খদ্দের ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন, সেলসম্যান বেচারি তো তটস্থ।

তবে সেলসম্যানকে রক্ষা করলেন ওই খদ্দের ভদ্রলোকই। তিনি বললেন, 'আমি তো ওর কাছে কোন জিনিস কিনতে চাইনি।'

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'তবে, আমি যে পরিষ্কার শুনলাম। ও স্পষ্ট বলছে আপনাকে, না হবে না, অনেকদিন নেই, এই সব।'

খদ্দের ভদ্রলোক বললেন, 'আমি বিদেশী মানুষ। তাই এই ছেলেটির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এখানে এবার এখনও বৃষ্টি হয়েছে কি না, তাতে ও বলল না। তখন আমি বললাম দুয়েকদিনের মধ্যে হবে বলে মনে হয় কি না। তার জবাবে ও বলল, না। হবে না। শেষে জানতে চাইলাম এখানে বৃষ্টি কতদিন নেই, তখন ও বলল 'অনেকদিন নেই।'

বলা বাহুল্য অন্তত এবারের মত ম্যানেজার সাহেব পিছু হটলেন।

শুধু কথোপকথনে বা নির্দেশ নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি হয় তা নয়। ঐ খগেনবাবুর ছেলে নগেনের মতো অথবা বিলিতি দোকানের ম্যানেজার সাহেবের মতো অবুঝ আচরণ খুব অস্বাভাবিক নয়। এগুলো তাৎক্ষণিক ভুল।

কিন্তু অনেক চিন্তা করে সাজিয়ে গুছিয়ে পয়সা খরচ করে লোকে বিজ্ঞাপন দেয়, তারও অর্থ একেক সময় বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে ভুরি ভুরি উদাহরণ দিতে পারি। তবে একটিমাত্র উদাহরণই দিচ্ছি। এক ভদ্রলোক তাঁর পোষা বুলডগটি বেচে দেবেন। নামে বুলডগ হলেও কুকুরটি ভাল, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বাছবিচার নেই। এমনিতে শান্ত, শিশুদের খুব পছন্দ করে। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল ঃ—

ভাল জাতের বুলডগ বিক্রয়। সব কিছু খায়। শিশুদের বিশেষ পছন্দ করে।

লেখাপড়া

আমার বিদ্যের দৌড় যে কতটা, সেটা পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন। সুতরাং এ কথা কবুল করতে দোষ নেই যে, লেখাপড়া নিয়ে আমার কিছু না লেখাই উচিত।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে? এই রম্য নিবন্ধমালার নাম করণেই গোলমাল হয়ে গেছে। বাঁচামরার জের এখনও চলেছে।

প্রত্যেক রবিবার সকালে আমাদের এলাকার এক নম্বর হাই স্কুলের বাংলার মাস্টার অভিরূপ আমাদের বাড়িতে আসে। আলু-চচ্চরি ও শুকনো লঙ্কা ভাজা সহযোগে আচারের তেল দিয়ে মাখা এক বাটি মুড়ি এবং তৎসঙ্গে বেশ কয়েক কাপ চা খায়।

বেশ কয়েক কাপ বলছি এই কারণে যে, অভিরূপ সারা সকালটা আম'দের

বাইরের ঘরে কাটায়। এর মধ্যে কয়েক স্রোত লোক থাকে। তাদের সঙ্গে অভিরূপও চায়ের ভাগ পায়।

অভিরূপকে নিয়ে আসার প্রধান অসুবিধাটা এই যে, সে বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে শিক্ষকোচিত দুশ্চিন্তা করে।

বাঁচামরা নাকি মরাবাঁচা, এই সমস্যা অভিরূপকে যথেষ্ট ভাবিত করেছিল। এখন তাঁর জিজ্ঞাসা দাঁড়িয়েছে বাঁচামরা কি সমাস?

আমি সোজাসুজিভাবে ভাবতে ভালবাসি। আমার সোজা উত্তর, বাঁচা ও মরা, বাঁচামরা—দ্বন্দ্ব সমাস।

কিন্তু সে এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে মুখে মুখে তিন-চার রকম ব্যাসবাক্য বানিয়ে ফেলল। যথা, যাহা বাঁচা তাহা মরা, বাঁচা ও মরার সমাহার, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু এই অভিরূপের ব্যাপারই নয়।

চিরকালই আমার লেখাপড়া নিয়ে লোকের প্রচুর সন্দেহ। যত ভালভাবেই পড়াশোনা করি কোন সুবিধা হয় না আমার।

সুদুর অতীতকালে সেই যখন আমি কলেজে পড়তাম, আমার পুজনীয় পরলোকগত মাতামহ বছরে দু'য়েকবার আমার লেখাপড়ার খোঁজ করতেন।

একবার বার্ষিক পরীক্ষার পরে মাতামহ জানতে চাইলেন, 'পরীক্ষার ফল কেমন হয়েছে?'

আমি গর্বিতভাবে বললাম, 'আমি ক্লাসের মধ্যে সেকেণ্ড হয়েছি।'

মাতামহ খুশি হলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সেকেণ্ড কেন? ফার্স্ট হতে পারো না?'

পরের বছর মাতামহ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরীক্ষার রেজাল্ট কি হল?' এবার আমার জিতবার পালা। আমি বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলাম, 'ফার্স্ট হয়েছি।'

মাতামহ কিন্তু এবারেও খুশি হলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন 'তোমাদের এ কি রকম কলেজ, যে কলেজে তোমার মত ছেলে ফার্স্ট হয়?'

লেখাপড়ার বিষয়ে এবার এই রকমই নির্মম আরেকটি গল্প মনে পড়ছে।

লোকটির নাম কায়সুল। কায়সুল ছোটবেলায় মোটেই লেখাপড়া শেখেনি। সামান্য অ-আ-ক-খ পর্যন্ত তার বিদ্যা। কায়সুলের বাবা এক সরকারি অফিসে ছোট চাকরি করতেন। তিনি হঠাৎ মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যুর পর সরকারি প্রথা অনুসারে কায়সুলকে একটা পিয়নের চাকরি দেয়া হয়। কিন্তু সে চাকরির সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অষ্টম শ্রেণী পাস।

এই সামান্য লেখাপড়াও কায়সুলের না থাকায় কায়সুলের পিয়নের চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। তখন সে টুকটাক ব্যবসা শুরু করে।

বাণিজ্য বুদ্ধি কায়সুলের প্রখর। সে ইধারকা মাল উধার এবং উধারকা মাল ইধারের ব্যবসা করে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। এখন তার মাসিক আয় লক্ষাধিক টাকা।

একটা সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে কায়সুল কয়েকদিন আগে শহরের এক বড় উকিলের কাছে গিয়েছিল। উকিল সাহেব দলিল রচনা করে কায়সুলকে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখুন।'

কায়সুল দলিল ফেরত দিয়ে উকিল সাহেবকে বলল, 'আমি লেখাপড়া জানি না, আপনি পড়ে শোনান।'



উকিল সাহেব বললেন, 'সে কি আপনি নিরক্ষর? আপনি এতেই এত উন্নতি করেছেন। লেখাপড়া শিখলে না জানি কি হত?

ঠাণ্ডা গলায় কায়সুল বলল, 'আর কি হত? সেই পিয়নের চাকরি না পাওয়ার কথা তার মনে ছিল। একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, 'বড় জোর হেড পিয়ন হতাম।'

পুনশ্চ ঃ মানুষ যা পড়ে তাই শেখে। মানুষ যা দেখে তাই শেখে।

এক বিখ্যাত তাস খেলোয়াড়ের শিশুপুত্র সংখ্যা গুনতো এই ভাবে,'এক-দুই-তিন..... নয়-দশ-গোলাম-বিবি-সাহেব। এ ভাবেই সে জন্ম ইস্তক দেখে এসেছে, সেটাই শিখেছে।

ডাক্তার

বাঁচামরা শীর্ষক রম্য নিবন্ধ সপ্তাহের পর সপ্তাহ লিখে যাব অথচ এই মর পৃথিবীতে স্বয়ং ঈশ্বর যাঁদেব বাঁচামরার ইজারা দিয়েছেন সেই ডাক্তার সাহেবদের কথা এড়িয়ে যাব, তা তো হতে পারে না। তাই আগেভাগে ডাক্তারসাহেবদের একটু স্মরণ করে নিচ্ছি। কিন্তু তারও আগে আমার মনের মধ্যে একটা খটকা দেখা দিয়েছে।

বাঁচামরা লেখা কি ঠিক হয়েছে?

বাঁচামরা না মরাবাঁচা?

এরকম প্রশ্নে অভিধান ঘাঁটতে চাই না। কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না। বরং কোন সাধারণ লোকের কাছে যাচাই করা উচিত।

আমার হাতের কাছে ঠিক সাধারণ নয়, এক অসাধারণ মানসী আছেন, তিনি আমার সুপ্রাচীনা গৃহিণী। বিদূষী ভার্যা প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বেঁচে গেলে বাঁচামরা, মরে গেলে মরাবাঁচা।' এই আশ্চর্য হেঁয়ালির মানে তারাপদ রায় কিছু বুঝতে পারছেন না।

স্ত্রৈণ তারাপদ রায়ের কথা নয়। এবার নিজের কথা একটু বলি। কয়েক বছর আগের কথা।

টাঙ্গাইলে আমার মায়ের মৃত্যুর সময়ে আমার উন্মাদ দাদা সমেত আমরা ভাইয়েরা, আমাদের পরিবার পরিজন সবাই পৌঁছে গিয়েছিলাম।

দু'বেলা ডাক্তার আসতেন। একদিন দাদা প্রবীণ ডাক্তার সাহেবকে চ্যালেঞ্জ জানাল, 'আপনি এই এতসব ওষুধ দিচ্ছেন, চিকিৎসা করছেন-এগুলো না হলে মা মরে যাবে?'

ডাক্তার সাহেব দাদাকে বহুকাল ধরে চেনেন, তিনি একটু গুম মেরে থেকে

বললেন, 'বলা কঠিন।'

এবার দালা মোক্ষম প্রশ্ন করল, 'আপনার চিকিৎসায় এইসব ওষুধ খেয়ে মা বেঁচে যাবে?'

ডাক্তার সাহেব এবারও বললেন, 'বলা কঠিন।'

বাঁচামরা নিয়ে সত্যিই কিছু বলা কঠিন। সুতরাং ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ডাক্তারীর ছাত্র দিয়ে শুরু।

* * * * * *

ডাক্তারী ক্লাসে অধ্যাপক ছাত্রদের বললেন, 'অনেক লোকই নিজেকে অসুস্থ মনে করে, কিন্তু তার কোন রোগই নেই। এরকম কোন রোগী যদি তোমাদের কাছে আসে, কি করবে?'

এই প্রশ্নে একটি ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তাকে এমন একটা ওষুধ প্রথমে দেব যাতে তার অসুখ হয়। তারপর আমি তার সেই অসুখের চিকিৎসা করব।'

অধ্যাপক বললেন, 'চমৎকার! তুমি তো দেখছি সবই জেনে গেছ। তবে আর ক্লাস করছ কোন দুঃখে? যাও, প্র্যাকটিস শুরু করে দাও।'

শোনা যায় এই ছাত্রটি পরে যখন ডাক্তার হয়েছিল তাকে তার এক রোগী বলেছিল, 'ডাক্তার বাবু অসুখে এত কষ্ট পাচ্ছি যে একেক সময়ে ইচ্ছে করছে, নিজেকে নিজে হত্যা করি।'

ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, 'আপনাকে ও কাজ করতে হবে না। ও ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন।'

তবে ডাক্তার-রোগীর ব্যাপার নিয়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ গল্প বোধহয় এক ডাক্তার এবং এক মোটর গাড়ির মেকানিক নিয়ে।

মেকানিক ব্যক্তিটি ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছেই থাকে। গাড়ির মেকানিক, যতই শক্তপোক্ত শরীর হোক, মানুষের দেহ তো, কখনও জ্বর হয়, কখনও পেটের গোলমাল, কখনও কোমরে বা কাঁধে ব্যথা। মেকানিকটি ডাক্তারবাবুর চেম্বারে যায়, অন্য দশজনের মত চল্লিশ টাকা ভিজিট দেয়, প্রেসক্রিপশন নেয়, তারপর দোকানে গিয়ে ওষুধ কেনে।

এবং ভাল হয়ে যায়। সে ভাল হওয়া ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার গুণে, ওষুধের জোরে কিংবা নেহাতই সাধারণ প্রাকৃতিক কারণে তা নিয়ে উক্ত মেকানিকের কোন চিন্তা নেই, চিন্তার অবকাশও নেই।

এদিকে হয়েছে কি ডাক্তারবাবুর ঝা চকচকে নতুন ডিজেল-এসি গাড়িটি ঠিক বারো মাসের মাথায় মানে গ্যারান্টি পিরিয়ডের ঠিক পরেই খারাপ হয়ে

গেছে। গাড়ি কোম্পানিতে গিয়ে লাভ নেই। খামোখা কিছু ঝামেলা বাড়বে। তারা আর বিনি পয়সায় সারিয়ে দেবে না। তদুপরি গাড়িটা অনেকদিন ফেলে রাখবে।

সুতরাং ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়ির কাছের সেই মোটর মেকানিক যে আবার তাঁর প্রাক্তন রোগী তার কাছে গাড়িটা নিয়ে যান। গাড়িটি দেখে মেকানিকটি বলল, দু'য়েকটা পার্স পালটাতে হবে, সেগুলো ডাক্তারবাবুকে কিনে আনতে হবে আর চার শ' টাকা লাগবে তার পারিশ্রমিক।



চার শ' টাকা শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি মানুষ দেখতে চল্লিশ টাকা নেই। আর তুমি তার দশগুণ চার শ' টাকা চাইছ গাড়ির জন্য!

মেকানিকটি বলল, 'আপনার তো সেই আদ্যিকালের পুরনো মডেল নিয়ে কারবার, মানুষের শরীরের কোন নতুন রদবদল, আলাদা-আলাদা নেই, সব এক রকম। আর আমাদের কি ঝামেলা বছর বছর মডেল বদলাচ্ছে, একেক বছর একেক গাড়ি, একেক রকম। সাধে কি আর চার শ' টাকা চাইছি।'

মান-অপমান

মান-অপমান খুব জটিল বিষয়। আগে শব্দগতভাবে এবং ব্যাকরণের প্রতিক্রিয়ায় একে দু'দিক থেকে বিবেচনা করে দেখি তারপর গল্পগাছা।

যেমন সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি, যেমন দেবতা-অপদেবতা (ভূত), যেমন কৌশল-অপকৌশল ঠিক তেমনই মান-অপমান। বাংলায় ঋণাত্মক প্রত্যয় না বলে পণ্ডিত পাঠকদের সুবিধার জন্য ইংরেজী করে বলছি, অপ সফিক্সটি Suffix নিগেটিভধর্মী। এই অর্থে অপ পাঠক-অপপাঠিকারও অভাব নেই। অন্তত আমার ক্ষেত্রে।

এবার সমস্যাটা বলি। সমস্যাটা খুব সোজা। এই 'বাঁচামরা' বাঁচা ও মরার মতই মান-অপমান, মান ও অপমান নিতান্তই দ্বন্দ্ব সমাস। ব্যাকরণ নিয়ে কচকচি সকলের পছন্দ নয়। মান-অপমানের ক্লাসিক গল্পটি বরং পাঠক-পাঠিকাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই। ঠিক গল্প নয়, একটা চিঠি। এই চিঠির কথা অনেকেই জানেন, আমিও দুয়েকবার ভিন্ন আঙ্গিকে লিখেছি।

গাঁয়ের গরিব ঘরের ছেলে মানিক। শহরে চৌধুরী সাহেবের বাসায় কাজ করে। সে তার গাঁয়ের পুরনো বন্ধু রতনকে চিঠি লিখেছে, সেই চিঠির শেষাংশঃ

ভাই রতন,

.... এখানে চৌধুরী সাহেবদের বাসায় লাথিঝাঁটা খাইয়া কোন রকমে আছি। ইহারা কথায় কথায় বাপ-মা তুলিয়া গালাগাল করে। কত রকমের বাচ্চা বলে তাহা আর কি বলিব। তাহা ছাড়া জুতা মারে, লাথি মারে। সেদিন চায়ে চিনি বেশি হওয়ায় চৌধুরী সাহেব লাথি মারিয়া সিঁড়ির ওপরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

আজ সকালে চৌধুরী সাহেবের ভাগিনার জুতা কালি করিতেছিলাম। কালি করা ঠিক হয় নাই, এই বলিয়া সে জুতা মারিয়া আমার উপরের পাটির সম্মুখের

দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। বড় দুঃখে আজ তোমাকে এই চিঠি লিখিতেছি। আমার ভয় হইতেছে হয়তো, ইহারা কোনদিন আমাকে অপমান করিয়া বসিবে।

......ইতি

তোমার মানিক।



বলা বাহুল্য, এই চিঠির কোন তুলনা নেই। এই সূত্রে আমার নিজের কথাও বলা উচিত। আমার এখন সন্দেহ হয় বোধহয় আমারও মান-অপমান বোধের যথেষ্ট অভাব আছে।

কতবার ওপরওয়ালার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমার সহকর্মীরা আমাকে বলেছেন, 'আপনাকে বড়সাহেব এত অপমান করলেন।' ......আমি বিস্মিত হয়ে ভেবেছি, কখন অপমান হলাম, আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।

প্রবীণ সম্পাদক আমাকে একটা রম্য রচনা দিতে বলেছিলেন, রম্য রচনা দেওয়ার দিন সাতেক পর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'লেখাটা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বড় করে দাও, চমৎকার ছোট গল্প হবে।'

আমি সরল মনে খুশি হয়ে লেখাটি নিয়ে চলে এলাম। সম্পাদকের ঘরে সেই সময়ে আরো দু'জন সহযোগী লেখক ছিলেন। তাঁদের একজন আমার পিছু পিছু এসে চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলেন, 'এত অপমান হলেন, এর

পরেও এ কাগজে লিখবেন?'

আজো জানিনা, সত্যিই সেদিন সম্পাদক মহোদয় আমাকে অপমান করেছিলেন কি না?

পুনশ্চ ঃ

সরকারি খতিয়ানে লেখা ছিল ডাঙ্গা জমি। দলিল দস্তাবেজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ভদ্রলোক বেশ চড়া দামে জমিটা কিনেছিলেন।

জমিজমার ব্যাপারে কাগজ কথা বলে, এই আপ্তবাক্য স্মরণ রেখে ভদ্রলোক কেনার আগে জমিটা দেখতে যাননি। গিয়ে দেখেন, এই শীতকালেও জমির ওপরে তিনহাত জল।

যে দালাল জমিটা বন্দোবস্তো করে দিয়েছিলেন তাঁকে সামনাসামনি পেয়ে তাঁর কলার চেপে ধরলেন। দালাল বললেন, 'মাফ করুন স্যার জমিজমার মধ্যে আমি আর নেই। তবু আমি আপনার যতটুকু পারি সুরাহা করে দিচ্ছি।'

কলার ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কি সুরাহা?'

জামার কলারটা দু'হাতে মসৃণ করতে করতে দালাল একবার মাথা চুলকিয়ে তারপর কিছুক্ষণ হাত কচলিয়ে বললেন, 'আপনার জমিতে খুব জল স্যার?'

'জল মানে?' ভদ্রলোক খেঁচিয়ে উঠলেন, এই অগ্রহায়ণ মাসেও সেখানে টইটম্বুর গলা জল। দালাল বললেন, 'জলের সমস্যার সমাধান এখন আমার হাতে স্যার।'

জমির ক্রেতা ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি রকম?'

দালাল বললেন, 'আপনাকে বললাম তো স্যার, জমির কারবার আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমি এখন নৌকোর কারবার করি। সস্তায় খুব ভাল ভাল নৌকো। আপনি একটা নৌকো কিনুন স্যার।'

জুতো ও জ্যোতিষী

জুতো দিয়েই আরম্ভ করি। আগে সেই জামাতা বাবাজীবনের পুরনো, বিখ্যাত গল্পটি আরেকবার হোক, তারপর জুতো ও জ্যোতিষীর কথা।

জামাই ষষ্ঠীতে জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। নতুন জামাই। তার জন্যে ধাক্কাপাড় তাঁতের কোরা ধুতি, হালফ্যাশনের রঙিন নকশা-কাটা পাঞ্জাবি, ব্রাউন

রঙের মোকাসিন জুতো—এসব উপহার কেনা হয়েছে।

শ্বশুরমশায় সৌখিন ব্যক্তি। তিনি কন্যা-জামাতার জন্যে জিনিসপত্র কেনার সময় নিজের জন্যেও এক জোড়া চপ্পল কিনেছেন, কোলাপুরী চটি।

শ্বশুরমশায়ের পায়ের চটিজোড়া জামাতা বাবাজির খুব পছন্দ। শ্বশুরমশায়ের পায়ের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'বাঃ, চমৎকার চটিটা।'

এ রকম বার দু'-তিনেক 'চমৎকার', 'খুব সুন্দর' বলার পর বাধ্য হয়ে শ্বশুরমশায় বললেন, 'এ চটিজোড়া তোমার খুব ভাল লেগেছে?'

জামাই বলল, 'ভাল লাগে না? এত সুন্দর চটি।' শ্বশুরমশায় বললেন, 'তা হলে এ চটিজোড়া তুমি নিয়ে নাও। নতুনই তো।'

জামাইয়ের নেওয়ার খুব ইচ্ছা। কিন্তু চক্ষুলজ্জার কারণে বলল, 'কিন্তু কেউ যদি আপনাকে বলে, আপনার পায়ের নতুন চটিজোড়া কি হল? কি বলবেন?'

'কি আর বলব,' শ্বশুরমশায় একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'বলব কুকুরে নিয়ে গেছে।'

জুতোর ব্যাপারে আমার অবস্থা কিন্তু এই জামাতা বাবাজির মত নয়, কিন্তু খুব গোলমেলে।

আজ কিছুদিন হল আমি জুতো চুরি যাওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত আছি। যে সব সভাসমিতিতে জুতো খুলে রেখে মঞ্চে উঠতে হয় বা সভাকক্ষের মেঝেতে বসতে হয়, সে সব সাহিত্য সভায় আমি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

একটা কথা, সাহিত্যসভায় খুব জুতো-চোর থাকে। স্বয়ং শরৎচন্দ্রের জুতো চুরি গিয়েছিল। আমি নিজে অন্তত দু'বার, একবার ল্যান্সডাউনে গীতা ভবনে প্রেমেন্দ্র মিত্রের, অন্যবার বনগাঁয় কবিসভায় কবি শিবশম্ভু পালের জুতো চুরি হওয়ার ঘটনার সাক্ষী।

সে যা হোক, কয়েকদিন আগে বিশেষ প্রয়োজনে বর্ধমান যাচ্ছিলাম। ট্রেনে আমার সামনেই বসে ছিলেন গেরুয়া-বসন চাপদাড়ি এক ব্যক্তি। তিনি নিজে থেকেই আত্মপরিচয় দিলেন, 'আমি একজন জ্যোতিষী। সপ্তাহে তিনদিন বর্ধমানে বসি, তিনদিন কলকাতায়।'

কিঞ্চিৎ পরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করে আমার হাত ধরে কররেখা বিচার করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ দেখেটেখে বললেন, 'সামনে আপনার শোকের দিন আছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মানে?' তিনি বললেন, 'আপনার মা মারা যাবেন।'

'আমার মা,' আমি অবাক, 'তিনি তো বহুকাল আগে বিগত হয়েছেন।' জ্যোতিষী একটুও না দমে বললেন, 'তা হলে আপনার শাশুড়ি মারা যাবেন।' এবারে আমি রহস্য করে বললাম, 'আমি তো বিয়েই করিনি। শাশুড়ি আসবে কোথা থেকে?'



জ্যোতিষীর তখন রোখ চেপে গেছে। তিনি বললেন, 'তা হলে আপনার ছাতা হারাবে।' আমি আবার মিথ্যে বললাম, 'আমি ছাতা ব্যবহার করি না।'

আমার দুই হাতের তালু আবার খুবই অভিনিবেশ সহকারে দেখে তিনি বললেন, 'শিগগিরই আপনার জুতো চুরি যাবে।'

সেই থেকে জুতো চুরির ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছি।